ওঁ সচ্চিদানন্দায় নমঃ।

হরিলীলা।

২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড।

বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত

অক্ষয়কুমার ঘটক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

-দি ব্রাহ্মস

নিবেদন।

বৃথা উপন্যাস ও নাটকাদিতে দেশের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বালকবালিকা যুবকযুবতী সকলেই বিলাস এবং নাস্তিকতায় নিমগ্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে কত শাস্ত্রপাঠ, কত কথকতা, কত সদুপদেশ, এমন কি যাত্রাদির মধ্যেও কত ধর্ম্মকথা শিক্ষা দেওয়া হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে পূর্ব্ব ব্যবস্থা সমুদায়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে দেশের সমূহ অকল্যাণ হইয়াছে। সার পদার্থ যে আত্মা, সেই আত্মার কিছুমাত্রও [illegible] সাধিত হইতেছে না। দুঃখের কথা বলিব কি, [illegible] বিদ্যালয়ের ছোট ছোট বালকেরা পর্য্যন্তও বলি[illegible] থাকে, "ঈশ্বর আছেন কি না তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।" এই সকল অমঙ্গল দূর করিবার জন্যই শ্রীহরির আদেশে এই "হরিলীলা" লিখিত হইল। আমার মত মূর্খ লোকের পক্ষে এরূপ গ্রন্থ রচনা করা নিতান্তই অসম্ভব। ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াই আমি এই সমুদায় লিখিয়াছি। যদি ইহাতে কোন সুন্দর ভাব থাকে, তাহা ঈশ্বরপ্রদত্ত, আর যদি কোন কুভাব থাকে, তাহা [illegible] পাপীর লিখিত। "হরিলীলা" নিজে হরি বিনা আর কেহই প্রকাশ করিতে পারেন না। অতএব পাঠকপাঠিকা, এই পুস্তকখানি [illegible] সত্যই ভগবানের নিজ লীলা বলিয়া বুঝি[illegible]
করিয়া যদি মনে একটুও আন[illegible]
হরিরই জয়ধ্বনি করিবেন[illegible]
মধ্যে এক বিন্দুও নাহি।
সে কি লিখিতে হ[illegible], তেমন
কি লিখিয়াছি। [illegible]বনি বা[illegible]
"মা" বোল ফুটাইয়াছি[illegible]
[illegible] এই "হরিলী[illegible]

"হরিলীলা" পাঠ করিয়া কাহারও কিছু উপকার হইবে কি না, তাহা জানি না। কিন্তু, আমার বিশেষ নিবেদন, [illegible] কাহারও কিছু উপকার হয়, তিনি যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা আমাকে তাহা জ্ঞাত করেন। কেন না, একজনেরও কিছু উপকার হইয়াছে জানিলেও প্রাণে অতুল আনন্দ পাইব। ইহার প্রথম খণ্ড যখন স্বতন্ত্রাকারে বাহির হইয়াছিল, তখন একজন লোক ছুটিয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "মহাশয়! 'হরিলীলা' পড়িয়া [illegible] পরিত্রাণের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি।" [illegible]ক্তির সে ভাব এখনও আমার মনে জাগ্রত রহিছে। আর, যাঁহাকে ইহা উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল, যখন তাঁহার নিকটে আমি উক্ত উপহার-পত্রটী পাঠ করিয়াছিলাম, তখন তাঁহার চক্ষে ঝরঝর করিয়া অশ্রুবর্ষণ হইয়াছিল। এবং তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন "তুমি আমার নিকটে কিছুই অপরাধ কর নাই।" ইহাতেই আমি প্রাণে যথেষ্ট শান্তিলাভ করিয়াছি।

[ ] এই চিহ্নিত বাক্যগুলি শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি।

এই গ্রন্থে যে সকল সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার দুই একটী ভিন্ন সমস্তই "গীতরত্নাবলী" নামক পুস্তক হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

[illegible]চন্দ্রের জীবন চরিতের ব্রহ্মচর্য্য অংশ একপ্রকার [illegible] গৃহধর্ম্ম এবং সন্ন্যাসাংশ অবশিষ্ট [illegible]গুটী সাধারণের নিকটে আদৃত [illegible]কাশ করিতে যত্ন করিব।

নিবেদক

শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য।

আনন্দ-আশ্রম।

এই পুস্তকে যে "আনন্দ-আশ্রমের" কথা বর্ণিত হইয়াছে, আমি কলিকাতা অথবা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে উক্ত "আনন্দ-আশ্রম" নামে তদনুরূপ একটী আশ্রম স্থাপন করিতে বাসনা করিয়াছি। সাধনভজন করিয়া সাধুতা অথবা ঋষিত্ব লাভ করা এবং জনসমাজের কল্যাণার্থ ধর্ম্ম-প্রচার করাই আশ্রমস্থ সাধকদিগের উদ্দেশ্য হইবে। কলিকাতায় হরিসেনামণ্ডলী নামে আমাদের একটা দল আছে, তাহাতে নিয়মমত উপাসনা এবং নামকীর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু, অর্থাভাবে আমরা কেহই বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সাধনভজনে লিপ্ত হইতে পারিতেছি না, সুতরাং আমাদিগের দ্বারা যতদূর আশা করা যায়, ততদূর কার্য্য হইয়া উঠিতেছে না। সেইজন্যই আমি এই "হরিলীলা" পুস্তকের পাঠকবর্গকে নিবেদন করিতেছি যে, প্রত্যেক পাঠকই যদি এই মহদুদ্দেশে কিছু কিছু দান করেন, তাহা হইলে আমি চিরবাধিত হইব। দেশে এত রাজা এত জমিদার এবং এত ধনীলোক থাকিতেও যে এমন একটী সুন্দর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে না, এরূপ মনে হয় না। যাঁহারা "আনন্দ-আশ্রমের" সমুদায় বৃত্তান্ত জানিতে চাহেন, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পুর্ব্বক [illegible] লিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান ক[illegible]

কলিকাতা,
২৯/১ নিয়োগীপুকুর ই[illegible]
১৫ই শ্রাবণ, ১২৯৮।

দশম পরিচ্ছেদ।

নব বিধান।

আবার স্বর্গের কথা। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই কথা সর্ব্বদা না বলিয়া থাকিতে পারেনা। আমরা স্বর্গ ভালবাসি, তাই কথায় কথায় স্বর্গেরই কথা বলি। স্বর্গ আমাদের জন্মস্থান, স্বর্গ আমাদের শেষবিশ্রামস্থান। আমরা স্বর্গ হইতে আসিয়াছি, আবার ভবের ধূলিখেলা সাঙ্গ করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গেই চলিয়া যাইব। সেইজন্যই জগতে স্বর্গের এত আদর। স্বর্গকে আদর করে না এমন নরনারী জগতে নাই। স্বর্গের কথা শুনিতে ভালবাসে না এমন পাগল কে আছে? স্বর্গ অমৃতধাম, স্বর্গ শান্তিনিকেতন, স্বর্গ মাতৃক্রোড়। মাতৃক্রোড়ে যাইতে কাহার না সাধ আছে? মাতৃবক্ষে ক্লান্ত কলেবর ঢালিয়া দিতে কে না বাসনা করে? পৃথিবীর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত অবলোকন কর, দেখিবে এই স্বর্গের জন্য রাজরাজেশ্বর হইতে পথের ফকির পর্য্যন্ত সকলেই উৎসুক। বিজ্ঞানী, কবি, পণ্ডিত, সকলেই এই দিব্যধামে গিয়া প্রাণ জুড়াইতে ইচ্ছা করেন। দীন হীন কাঙ্গাল এই মর্ত্তভূমিতে অত্যাচরিত পরপদ-দলিত এবং একমুষ্টি অন্নের জন্য লাঞ্ছিত হইয়াও কেবল ঐ শান্তিভবনের জন্য দগ্ধ জীবনভার বহন করিতেছে। কুসুম-কোমলা পবিত্রহৃদয়া সতী প্রাণপতির বিয়োগে যৌবনে যোগিনী হইয়া কেবল ঐ দিব্যলোকে প্রাণেশ্বরের মুখকমল দর্শন আশে প্রাতর্সন্ধ্যা আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

ওখানে যাইলে আর অন্নবস্ত্রের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, ওখানে যাইলে আর দারিদ্র্য ব্যাধিতে কাতর হইয়া ছট্ ফট্ করিতে হয় না, ওখানে যাইলে আর অপমানিত হইয়া পথের ধূলিতে মুখ লুকাইতে হয় না, ওখানে যাইলে আর পাপের ভীষণ যাতনায় অনুতাপের অশ্রুবারিতে শয্যা সিক্ত করিতে হয় না, এবং ওখানে যাইলে আর আত্মীয় বন্ধুজনের অদর্শনে হাহাকার করিতে হয় না। যেখানে চিরপ্রফুল্ল পারিজাতের সুধাধারা পানের জন্য নারদের বীণা দিবানিশি গুন্ গুন্ স্বরে ঝঙ্কার করিত, ঐ স্বর্গলোকে ঐ [illegible] নিবাসে স্বর্গের ঈশ্বরী আনন্দময়ী মা আমার নিজ হস্তে পাপী তাপী সাধু সকলের কণ্ঠে সেই দিব্যপ্রসূনের মালা পরাইয়া দিতেছেন। অতএব পাঠক পাঠিকা, নীরবে আমার পশ্চাতে আগমন কর, একবার সকলে মিলিয়া ঐ অমরলোকে বেড়াইয়া আসি।

ঐ শুন, সেই পূর্ব্বপরিচিত দেবোদ্যানে বিবেক ও বৈরাগ্য আবার কি কথোপকথন করিতেছেন। বৈরাগ্য দুঃখিত স্বরে বলিতেছেন, "ভাই বিবেক! ভারতে কি আমাদের অধিকার আর হইবে না? কতকাল আর আমরা ভারত হইতে দূরে দূরে বাস করিব? দেখ, ক্রমে ক্রমে শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, মুখের উৎসাহভাতি নিবিয়া যাইতেছে। মনে স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে আনন্দ নাই ও প্রাণে সুখ নাই। পূর্ব্বে ভারতে আমাদের কতই সুখ ছিল। তখন গৃহে গৃহে [illegible]! আদরে পূজিতাম। তখন হরিপাদপদ্ম ভুলিয়া কেহই ঘোর সংসারে মুগ্ধ ছিল না।"

বিবেক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আর ভাই সে দুঃখের কথা বলিও না। পূর্ব্বকালের সুখসম্পদ স্মরণ করিলে

বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়। যে ভারত ধর্ম্মের জন্য একদিন সমগ্র ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিল, যে ভারতের গৃহে গৃহে অতিথিশালা ছিল, পথে পথে জলছত্র ছিল, যে ভারতে ক্ষুধানলে দুঃখীর উদর জ্বলিত না, মহাপাপ জীবহিংসা যে ভারতের সীমামাত্রেও পদার্পণ করিতে পারিত না, যে ভারতে দাতাকর্ণ, যে ভারতে বলি রাজা, যে ভারতে দধিচি মুনি, এবং যে ভারতে নিজসুখে উদাসীন পরের জন্য ভিখারী শ্মশানবাসী মহাদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে ভারতের আজ এ কি দুর্দ্দশা!"

বৈরাগ্য বিবেকের কথায় যোগদান পূর্ব্বক কহিলেন, "এখন দেখিতেছি সকলেই নিজ সুখে মত্ত। কিসে অতুল ধন সম্পত্তি হইবে, কিসে নিজ পত্নীর দেহ নানাবিধ মাণিক মুক্তার অলঙ্কারে বিভূষিত করিব, কিসে দেশের মধ্যে ধনী মানী বলিয়া সংনাম হইবে, এই চিন্তায় এই ভাবনায় সকলেই আকুল। দীন হীন নিরন্ন কাঙ্গালের মলিন মুখের দিকে চাহিবার লোক একজনও নাই। দেশ এখন ঘোর স্বার্থপর হইয়াছে। সম্মুখে যদি কেহ অনাহারে প্রাণত্যাগ করে, তথাপি তাহাকে একটা পয়সা দেওয়া হইবে না, এদিকে কিন্তু যাত্রায়, নাচে, থিয়েটারে অকাতরে শত শত মুদ্রা ব্যয় করা হইবে। আবার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন একটা উপাধি লাভের আশা থাকিলে ধনী লোকেরা আপনাদের পরিধানের বস্ত্রখানাও খুলিয়া দিতে কাতর হয়েন না। হায়! হায়! দেশ কি অজ্ঞান-অন্ধকারেই ডুবিয়াছে!

বিবেক বলিলেন, "ভারতে আর সতীর সতীত্ব রক্ষা হইতেছে না। মদ্যপানে দেশ উৎসন্নপ্রায়। বিদ্যালয়ের বালক তিন কড়ি গাল মদ খাইয়া কি সর্ব্বনাশই না করিয়াছে! শুদ্ধ তিন

কড়ি পালই বা কেন ? ঘরে ঘরে কত তিনকড়িই যে জন্মিয়াছেন, তাহা আর বলা যায় না। স্ত্রী হইয়া স্বামীর গলায় ছুরি মারে কখনও কি শুনিয়াছ ? না স্বামী হইয়া স্ত্রীর গলায় ছুরি মারে একথাই কখনও শুনিয়াছ ? এ সকল ভীষণ ব্যাপার ভারতে আজ কাল প্রায়ই ঘটিতেছে! আবার সেদিন নীলমাধব উপযুক্ত পুত্র হইয়া পিতাকে গুলি করিয়া বধ করিল!” বলিতে বলিতে বিবেক কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন। “হায়! হায়! মা বসুন্ধরে! তুমি এখনও এ হতভাগ্য দেশকে বুকে করিয়া রাখিয়াছ!”

বৈরাগ্যের চক্ষেও জল পড়িল। তিনিও ধীরে ধীরে বলিলেন, “দেশ যায় যায় হইয়াছে। ভগবানের পূজা ত দেশ হইতে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রপাঠ করিলেও আর কেহই শুনে না। হরিসঙ্কীর্ত্তনেও আর কেহই যোগ দেয়না। তবে দুই এক জন যাহারা প্রথম প্রথম গানের সুর শুনিয়া আসে, একটু পুরাতন হইলেই তাহারা চলিয়া যায়। ভক্তি না থাকিলে সুরে আর মানুষকে কতদিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে? এমনই দেশের অবস্থা হইয়াছে, যদি কেহ দুটো ভাল কথা বলে তাহাও কেহ শুনিতে না। কি যে এক মহাগরলের নদী ভারতের চারিদিক ঘেরিয়াছে তাহা আর বলা যায় না। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা তিনিই জানেন, আমরা কোন্ কীটানুকীট!”

ক্ষণকালের জন্য উভয়েই নীরব হইলেন। যেন কি একটা বিষম ভাবনায় একেবারে ডুবিয়া গেলেন। কিসের ভাবনা? স্বর্গলোকে এ কিসের ভাবনা? স্বর্গ কি আবার আকুল হইয়া ভাবেন? হাঁ ভাবেন বই কি? স্বর্গ ভাবেন তাই, পৃথিবী চলে।

স্বর্গ ভাবেন তাই মহাসূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বিশাল গ্রহ উপগ্রহ সকল প্রতিনিয়ত সবেগে নিয়মিতরূপে প্রধাবিত হয়। স্বর্গ ভাবেন তাই বসুন্ধরা নানাবিধ রূপ ও রসে পরিপূর্ণা হইয়া হাস্য করেন। স্বর্গ ভাবেন তাই জীবমণ্ডলী মহীমণ্ডলে অবলীলাক্রমে বিহার করিয়া বেড়ান। স্বর্গ ভাবেন তাই পৃথিবীর ধর্ম্মরক্ষা হয়। এবং স্বর্গ ভাবেন তাই অমূল্য নিধি হরিনাম আসিয়া পাপী মানবের প্রাণে শান্তিরস সিঞ্চন করে। ভারতে বর্ত্তমান দুঃখে ঐ দেখ, স্বর্গ ভাবিয়া আকুল। বিবেক ও বৈরাগ্য দুইটী ভ্রাতা অস্থির। ঐ শুন, বিবেক আবার, বলিতেছেন, "বলিব কি ভাই, আজকাল কতকগুলি লোক হইয়াছে, তাহারা গঙ্গাস্নান করে, হরিনামের ছাপা পরে, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, পরিধানে গৈরিক বসন, কপালে তিলক, মুখে দিবানিশি হরিধ্বনি, কিন্তু তাহাদের প্রাণের মধ্যে ঘোর নরক পোষা রহিয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি তাহাদের মনের মধ্যে বৃশ্চিকের ন্যায় হিলিবিলি করিয়া বেড়াইতেছে। আর একদলের লোক আছে, তাহারা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া কতই গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকে। আর ইংরাজীশিক্ষিত সভ্যতাপ্রিয় বাবুদের কথা ত বলিয়া শেষ করা যায় না। সাধুভক্তকে ভক্তি করা দূরে থাকুক, নিজ পিতামাতার পদধূলি গ্রহণ করিতেও তাঁহারা পরাঙ্মুখ। যদি কেহ সাধু ভক্তের চরণে প্রণাম করেন, কিম্বা হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবেশে নাচেন বা ক্রন্দন করেন, এই সব ভক্তিহীন বাবুরা তাঁহাকে একেবারেই হেয় ও অপদার্থ জ্ঞান করেন। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই ঘটিয়াছে!'

বৈরাগ্য বলিলেন, "বলিতে কি, ভারত সন্তানগণ একেবারে ঘোর নরকে ডুবিয়াছে। ধর্ম্ম বলিয়া যে একটা কিছু আছে, তাহা তাহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। যদিও ঠাকুর বলিয়া মাটির বা প্রস্তরের প্রতিমা পূজা করে, কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস বা ভক্তি নাই। কেবল সমাজের খাতিরেই পূজা করিতে হয়। আবার বলিদানের ছলে মাংস ভোজনটাও [illegible] হইয়া থাকে। ধর্ম্মের নামে এ অধর্ম্মটা যে কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। মা জগজ্জননীর সম্মুখে যদি কিছু বলি দিতে হয়, তবে সে বলি কি নিরীহ পশু? আহা! পশু গুলিকে যখন স্নান করাইয়া হাড়কাঠের নিকটে আনে, আর তাহারা শীতে ও প্রাণভয়ে ঘন ঘন কাঁপিতে থাকে, তখন তাহাদের দশা দেখিয়া কোন্ পাষণ্ডের চক্ষু হইতে জলবর্ষণ না হয়? এই কি মায়ের পূজা? মা হইয়া কি মা নিজের সন্তানকে ভোজন করেন? যদি বলি দিতে হয়, তবে উপাসক! মায়ের সম্মুখে নিজের পাপ-পশুকে বলি দাও। তাহা হইলেই মা সন্তুষ্ট হইবেন। নতুবা আর এরূপ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রশ্রয় দিও না।"

বিবেক বলিলেন, "আবার দুর্গোৎসবের দিন বাবুরা বন্ধুদিগকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া মদ ও মুরগির শ্রাদ্ধ করেন। ঠাকুরের সম্মুকে পয়সা দিয়া বেশ্যাগুলাকে নাচান। চণ্ডীপাঠের সময় শুনিবার জন্য ভাড়া করিয়া একজনকে প্রতিনিধি বসাইয়া নিজে কর্ত্তাবাবু খেমটা, বাই ও যাত্রার তদারকে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। সাধন ভজন ত একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে।"

বৈরাগ্য বলিলেন। "আবার সমাজের বন্ধনটাও খুব আছে। গোছা গোছা পৈতা গলায় দিয়া পল্লীগ্রামে গিয়া সুব্রাহ্মণ হওয়াও আছে, আবার কলিকাতায় উইলসন্ হোটেলে খানা খাওয়াও আছে। বেশ্যা ও সুরা ত সকলের প্রাণের প্রাণ।"

এমন সময়ে হরিপ্রেম হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি অন্তরাল হইতে আপনাদের সমুদায় কথাই শ্রবণ করিয়াছি। পতিতপাবন শ্রীহরির রাজ্যে বিবেকবৈরাগ্যের এই মনস্তাপ কখনই থাকিবে না। ইতিপূর্ব্বেই পুণ্যময় ভগবান আপনাদিগের দুঃখরাশি দূর করিবার সূত্রপাত করিয়াছেন। আপনাদিগের কি মনে নাই, শান্তিপুরের সেই দুর্দ্দান্ত পাপী প্রবোধচন্দ্রকে ঠাকুর কেমন সাধুসঙ্গ দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন; এক্ষণে আবার তাহাকে বৈরাগ্য, যোগ ও ভক্তি প্রভৃতি শিখাইয়া তাহার জীবনের ভিতর দিয়া এক নূতন লীলা জগতে প্রকাশ করিবেন। সেইজন্য আবার আমাদিগকে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে হইবে।"

বিবেক ও বৈরাগ্য হরিপ্রেমের এই কথা শুনিয়া যৎ-পরোনাস্তি আনন্দ সহকারে বলিলেন, "দেবি। আপনার কথা শুনিয়া আমাদের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল। পৃথিবীর অধর্ম্মে, অনাচারে ও অভক্তিতে যখনই আমাদের প্রাণ ব্যথিত হয়, অন্তর্যামী ঠাকুর যেন আমাদের মনোবেদনা জানিতে পারিয়াই, তখনই একটা না একটা লীলা প্রকাশ করেন। যখন ভারতের প্রাচীন জ্ঞান, বিশ্বাস ও ভক্তি বিলুপ্ত হইয়া, কেবল শুষ্ক ও বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের আবির্ভাবে দেশ শান্তিশূন্য হইয়াছিল, তখন আমাদের প্রেমাবতার শ্রীহরি শ্রীগৌরাঙ্গের

ভিতর দিয়া ভক্তির বিধান প্রকাশ করিয়া মৃত দেশকে বাঁচাইয়াছিলেন। আরবে দেশ যখন অজ্ঞানে ও নাস্তিকতায় একবারে ছারেখারে যাইতেছিল, রক্ষাকর্ত্তা ভগবান তখন মহম্মদের প্রাণে ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নি জ্বালিয়া জগতের অবিশ্বাস অন্ধকার বিনাশ করিয়াছিলেন। আর শ্রীঈশার বিধানের কথা কি বলিব? পরম পিতা যদি ঈশা হেন পুত্রকে পৃথিবীর বক্ষে বলি প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে সমুদায় ইউরোপ ও আমেরিকা আজিও বন্য জন্তুর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিত। নানকের বিধান, লুথারের বিধান প্রভৃতি আরও কত কত বিধান যে ভগবান জগতের কল্যাণের জন্য স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আর বলা যায় না। দেবি! এবার আবার ভগবানের কোন্ বিধান প্রকাশ হইবে?"

হরিপ্রেম উত্তর দিলেন, "এবারকার বিধানে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম সংযুক্ত থাকিবে না। ঠাকুর বলিয়াছেন—এত কাল পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য আমি কতই বিধান প্রচার করিয়াছি, কিন্তু কোন বিধানেই আমাকে সর্কোচ্চ স্থান প্রদান করা হয় নাই। আমার পরিবর্ত্তে আমার এক এক জন ভক্তকে সিংহাসন দান করা হইয়াছে। সেইজন্য এবার আমি পূর্ব্বপ্রচারিত সমুদায় বিধানের মাহাত্ম্য একত্রিত করিয়া এক নূতন বিধান প্রচার করিব। তাহাতে আমার নিজনাম ভিন্ন আর কোন ভক্ত মনুষ্যের নাম সংযোজিত হইবেনা। যদিও আমার লীলা পূর্ব্বের মত ভক্তজীবনেরই ভিতর দিয়া জনসমাজে প্রকাশিত হইবে, তথাপি তাহাতে সেই ভক্তের কিছুই মহিমা প্রকাশ পাইবে না। ভক্তের বলবুদ্ধি, জ্ঞান-

বৈরাগ্য, প্রেমভক্তি, সমুদায়ই আমার নিজস্ব ধন ; সে সমুদায়ের উপরে ভক্তের কোনই অধিকার নাই। সেইজন্য এবারকার বিধান "নববিধান" বা "ব্রহ্মবিধান" বলিয়া ঘোষিত হইবে, এবং আমি এই বিধানান্তর্গত ভক্তজীবনে যে সমুদায় লীলা বিহার করিব, তাহা "হরিলীলা" নামে প্রকাশিত হইবে।"

বৈরাগ্য বলিলেন, "তাহা হইলে এবারকার লীলায় বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার সমুদায় প্রকাশিত হইবে বোধ হইতেছে।"

হরিপ্রেম বলিলেন,"এবারকার এই লীলায় পৃথিবী তোলপাড় হইবে। যত প্রাচীন শাস্ত্র, সমুদায় মিলিত হইয়া এক শাস্ত্র হইবে। যত প্রাচীন ঋষি, তপস্বী, সাধু, ভক্ত, সমুদায়ের মিলন হইবে। মহম্মদের গলা ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিবেন। শাক্যসিংহের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ঈশা খেলা করিবেন। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ, শাস্ত্রে শাস্ত্রে কাটাকাটি, এ সমুদায় আর প্রেমময়ের রাজ্যে তিষ্ঠিতে পারিবে না। আরও যে কত কি হইবে, তাহা কে জানে! চলুন, আমরাও ত শ্রীহরির সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব, সেখানে গিয়াই যাহা যাহা সমুদায়ই দর্শন করিতে পাইব।"

এই বলিয়া হরিপ্রেম বিবেক ও বৈরাগ্যকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সাধুসঙ্গ।

সাধুসঙ্গ বিনা এসংসারে জীবের মুক্তি নাই। সাধুসঙ্গে ঘোর পাতকীও পুণ্যবান হইয়া যায়। সাধুসঙ্গে চোর রত্নাকর দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া শুদ্ধ শান্ত সমাহিত তপস্বী হইয়াছিলেন, এবং সাধুসঙ্গে দুর্দ্দান্ত জগাই ও মাধাই দেবদুর্ল্লভ প্রেম ও ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া স্বশরীরে স্বর্গসম্ভোগ করিয়াছিলেন। সাধুসঙ্গে সংসার-তাপে তাপিত প্রাণ শীতল হয়, সাধুসঙ্গে শোক-দহনে দগ্ধ হৃদয় শান্তিরসে স্নিগ্ধ হয়, এবং সাধুসঙ্গে পাপ-রোগে রুগ্ন আত্মা সুস্থ হয়। অতএব বন্ধুগণ! চল একবার আনন্দ-আশ্রমে আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত মহর্ষি যোগানন্দ এবং অন্যান্য সাধকদিগকে দর্শন করিয়া আসি। ঐ দেখ, সম্মুখে ঐ সেই আশ্রম পদ; ঐ দেখ ঐ সব নব বসন্তে মুকুলিত অলিকুলঝঙ্কারে মুখরিত সহকার তরুশ্রেণী; তাহাতে আবার হাস্যমুখী মাধবীলতা জড়াইয়া দিগদিগন্তে আরও সৌগন্ধ ঢালিয়া দিয়াছে। ঠিক উহারই পার্শ্বে বকুল বৃক্ষের শ্রেণী অপরূপ সৌরভে আশ্রমস্থ বনভূমি মোহিত করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার নবপ্রকাশিত চন্দ্রকিরণ পাতায় পাতায় চুম্বন করিয়া বেড়াইতেছে। এমন সময় মলয় পবন কি সুস্থির থাকিতে পারে? ঐ দেখ সে ধীরে ধীরে উন্মত্ত প্রণয়ীর মত একবার আম্রমুকুল আনিয়া বকুলপত্রে, আবার বকুলকুসুম লইয়া আম্রপল্লবে সাজাইতেছে। ঐ দিগন্ত প্রসারিত আকাশপ্রান্তে

সন্ধ্যার তারা স্থিরনেত্রে অবাক্ হইয়া মন্দমন্দ সমীরের এই ক্রীড়া দর্শন করিতেছে। কই, এমন সময়ে আমার সাধের একতারা কোথায়? হাতে পাইলে একবার বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে সেই গানটী গাইতাম, যে গানটীতে আছে—"বল দেখিরে তরুলতা, আমার জগতজীবন আছেন কোথা, তোরা পেয়ে বুঝি কল্লনে কথা, তাই তোদের কুসুম হাসে।"

চুপ কর, আমাকে আর গাইতে হইবে না। ঐ যে বীণার ঝঙ্কার। ঐ যে আকুল প্রেমিকের আকুল উচ্ছ্বাস শুন। একবার স্থির হইয়া শুন। ঝিল্লীরবের সঙ্গে ঝিঝিট রাগিণীতে আশ্রমের ভিতরে কে গাইতেছে—

ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখরে মায়ের হাসি।
কিবা মৃদুমন্দ সুধাগন্ধ ঝরে তাহে রাশি রাশি॥
অরূপ রূপের ছটা, বিচিত্র বরণ ঘটা,
ঘোরালো রসালো করে দিক আলো শোভা হেরে মন উদাসী॥
কুসুমে প্রাণ পাগল করে, পরশে ত্রিতাপ হরে,
মা হাসে ফুলের ভিতরে, (আমি) তাই ফুল এত ভালবাসি॥
তরুকুঞ্জে পুষ্পবনে, নিরখিয়ে নিরঞ্জনে,
ভাসে যোগানন্দে হাসে প্রেমানন্দে যোগী ঋষি তপোবনবাসী॥

প্রেমিক সত্যানন্দ বীণা বাজাইতে বাজাইতে গাছের তলায় তলায় ঐ প্রেমের গান গাহিয়া বেড়াইতেছেন। আনন্দময়ীর আনন্দময় আবির্ভাবে যুগপৎ সাধকহৃদয় এবং তপোবনভূমি পরিপূর্ণ। কেমন পাঠক। প্রাণ জুড়াইল কি?

চল, আর একটু অগ্রসর হও। ঐ যেখানে বৃদ্ধ মহর্ষি বসিয়া পরমাত্মার ধ্যান করিতেছেন, ঐখানে চল। ঐ দেখ

সত্যানন্দও গান করিতে করিতে ঐদিকেই যাইতেছেন। সত্যানন্দের গান থামিল, উনি বীণা রাখিয়া যোগানন্দের চরণে প্রণাম করিলেন। ঐ শুন, যোগানন্দ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কি বলিতেছেন। যোগানন্দ বলিলেন, "তোমারাই এই মৃত ভারতের প্রাণ। এইবার বোধ হয় তোমাদের এই বীণাঝঙ্কারে বিষয়-নিদ্রায় নিদ্রিত ভারত-সন্তান অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিবে।"

সত্যানন্দ বিনীতভাবে কহিলেন, "যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের আর গৌরব কি আছে? প্রেমময়ী জননী যুগে যুগে এইরূপে প্রেমভক্তির বীণা বাজাইয়া বিষয়াসক্ত নরনারীর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেন। তাঁহার বীণার স্বর শুনিয়া অসুর সমান মানবের পাষাণহৃদয়ও একেবারে গলিয়া যায়। তাহার সাক্ষী এই দেখুন না কেন, আমাদের প্রবোধচন্দ্রের মত উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র যুবকও কেমন মোহিত হইয়া পড়িয়াছে!"

যোগানন্দ ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল কথা মনে করিয়াছ। অনেক দিন হইল প্রবোধচন্দ্র গৃহে গমন করিয়াছে, তাহার কোন সংবাদ পাইয়াছ কি?"

সত্যানন্দ উত্তর দিলেন, "কিছুই সংবাদ পাই নাই। সেদিনে মনে করিতেছিলাম, শান্তিপুরে একবার গিয়া প্রবোধের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলে হয়।"

যোগানন্দ আনন্দ সহকারে কহিলেন, "উত্তম সংকল্প সত্যানন্দ! ধনীর সন্তান গৃহে গিয়া ঐশ্বর্য্য-ভোগে যদি হরিধনকে ভুলিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাদের দর্শনে হারানিধি পুনরায় পাইতে পারিবে।

সত্যানন্দ জিজ্ঞাসিলেন, "গুরুদেব! লোকে একবার হরিনাম পাইয়া আবার তাহা হারায় কেন?"

যোগানন্দ উত্তর দিলেন, "সঙ্গগুণে। মনে করিও না একবার কোন কারণ বশতঃ হরিনাম পাইলেই তাহা চির-কালের মত সঞ্চিত থাকিবে। যেমন ঘোর বিপদে পড়িয়া মানুষ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হয় এবং সেই বিপদের মেঘ কাটিলেই আবার তাঁহাকে বিস্মৃত হয়, তেমনই সাধুসঙ্গে নরনারী হরিনাম পাইয়াও আবার অসাধুসঙ্গে তাহা হারাইয়া ফেলে। এইজন্য সাধকের পক্ষে সাধুসঙ্গ চিরকালই অমূল্য রত্ন। সেইজন্যই শুকদেব গোস্বামীর মত সাধককেও মধ্যে মধ্যে তপোবনে গিয়া ঋষি মহর্ষিদিগের সঙ্গ লাভ করিতে হইত। সাত রাজার ধন এক মাণিককেও কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া বিষয়ী নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, কিন্তু সাত সমুদ্র ছেঁচা এই হরিনামরত্নকে সাধক হৃদয়কুটীরে সপ্ততালা লাগাইয়াও এক নিমিষের জন্যও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। আহা! সেদিন সেই বৃদ্ধ সাধকটী বেশ গানটী গাইতে ছিলেন,—"ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে, তোমারে যবে পাই দেখিতে; যেন হারাই হারাই, সদা মনে ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে।" বৎস! নিশিদিন নয়নে নয়নে না রাখিলে এ স্পর্শমণি কাহারও ঘরে থাকেন না।"

সত্যানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "তবেই ত বিষম বিপদ দেখিতেছি!" যোগানন্দ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বিপদ্-ভঞ্জনের শরণাপন্ন হও, তিনি কখনই আশ্রিত জনের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইবেন না।"

সত্যা। যদি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন ?

যোগা। তবে নিষ্কলঙ্ক নামে কলঙ্ক চাপাইয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিও।

সত্যা। এমন কি কখনও কোথাও হইয়াছে ?

যোগা। যদি হয় তবে তোমাকে দিয়া প্রথম হইবে। ভগবান বলেন, "কোন স্ত্রীলোক কি তাহার স্তন্যপায়ী শিশুকে কখনও বিস্মৃত হইতে পারে? বরং সেও বিস্মৃত হইতে পারে, তত্রাচ আমি তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারি না।" তিনি আরও বলেন, "পর্ব্বত সকল চলিয়া যাইবে এবং অধিত্যকা সকল স্থানান্তরিত হইবে, কিন্তু আমার দয়া কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না এবং আমার শান্তিপত্রের অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ হইবে না।"

এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিলেন, "জীবনের ভার আমায় দিয়ে, থাকরে নিশ্চিন্ত হয়ে, ভয় নাই ভবসাগরে ; আমাকে ভজনা করে, কে কবে গিয়েছে ফিরে, ডেকে দেখা না পেয়ে নিরাশ মনে সংসারে।" গান সমাপ্ত করিয়া আবার বলিলেন, "সত্যানন্দ! বিশ্বাসের রাজ্যে বিন্দুমাত্রও ভয় নাই। সম্মুখে হিমাচলের মত বাধাবিঘ্ন দেখিলেও কিছুমাত্রও ভীত হইবে না। হরিনামের তুড়ি দিয়া পাহাড় পর্ব্বত উড়াইয়া দিবে। মহাবিশ্বাসী ঈশার কথা স্মরণ কর— "সত্য সত্যই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যদি একটী সর্ষপকণার ন্যায়ও তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে, স্থানান্তর হও, অমনই উহা চলিয়া যাইবে, এবং তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব রহিবে না।" মহাযোগীর এই মহাকথা কখনই মিথ্যা হইতে পারেনা।"

এমন সময়ে সত্যসখা আসিয়া চরণে প্রণাম পূর্ব্বক যোগানন্দকে কহিল, "গুরুদেব। সায়ংকালীন উপাসনার সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব যদি আপত্তি না থাকে, তবে উদ্বোধনের সঙ্গীত আরম্ভ হউক।"

যোগানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া সত্যসখাকে কহিলেন, "সত্যসখা, আগামী কল্য প্রাতে তুমি এবং শান্তিপ্রিয় সত্যানন্দের সঙ্গে তোমাদের আদরের দাদা প্রবোধচন্দ্রকে দেখিতে শান্তিপুরে গমন করিও।" এই বলিয়া উপাসনা-কুটীরাভিমুখে গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা।

দেখিতে দেখিতে তপোবনের রাত্রি প্রভাত হইল। অদূরে বনকোকিল প্রভাতী বন্দনার উদ্বোধন করিল। ক্রমে ক্রমে সমুদায় বনবিহঙ্গ জাগরিত হইয়া মহোল্লাসে মহেশ্বরের মহানাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। পাখীর সঙ্গীত পাখীতেই বুঝে, আর সেই পাখীর দেবতা যিনি তিনিই বুঝেন। তুমি আমি কি বুঝিব বল? পাখীর এই স্বর্গীয় সামগানস্রোতে প্রাণ ঢালিয়া ভাসিয়া যাওয়া তোমার আমার কার্য্য নয়। জগতে কত প্রভাতে কত পাখী ডাকে, কিন্তু আমার প্রাণপাখী কি সকল সময়েই সেই ডাকের সঙ্গে নিজ প্রাণের ডাক মিশাইতে পারে? কখনই পারে না। যেদিন বনের পাখীর সঙ্গে মিশিয়া

প্রাণেশ্বরের বন্দনা করিতে পারিব, সেদিন ধন্য হইব। যাহা হউক, আজ কিন্তু প্রাণটা বড়ই মাতিয়াছে। চারিদিকে পাখীর সঙ্গীতে আমার প্রাণপাখী বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। তাহার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, ঐ রকম করিয়া সুললিত স্বরে একবার এই প্রভাতের দেবতার স্তুতিগান করে; কিন্তু পাখীর মত অমন স্বাভাবিক আনন্দ কই? অমন প্রাণোন্মাদিনী সঙ্গীত-লহরী কই? অমন পরম দেবতায় স্থির বিশ্বাস কই? অমন স্বর্গীয় নিশ্চিন্ততা কই? প্রাণ আমার অন্নচিন্তায় নিরানন্দ, কণ্ঠস্বর ক্রোধগর্জ্জনে কর্কশ, হৃদয় বিশ্বজননীর উপর অবিশ্বাসী, মন অসার বিষয়সুখচিন্তায় নিরন্তর চিন্তিত। এমন হৃদয় এমন মন এমন প্রাণ লইয়া কি মর্ত্ত্যের মানব স্বর্গের দেবতার পূজা অর্চ্চনা করিতে পারে? মন প্রাণ শুদ্ধ ও নিশ্চিন্ত না হইলে বিশ্বেশ্বরের পূজার উপকরণ হইতে পারে না।

সত্যানন্দ প্রভাতে জাগরিত হইয়া গান ধরিলেন—

আর নাহি রাতি, পূরবে ভাতি,
গাও জগপতি মঙ্গল গাথা;

অদূরে বালক সত্যসখা এবং শান্তিপ্রিয় গাহিল—

মঙ্গল স্মরি, উঠ নরনারি,
ভকতি করি শুন হরিকথা।

পরে তিনজনে একত্রে গাহিলেন—

আলোকে আঁধারে, কোলাকুলি করে,
দুইটী সোদরে স্নেহ প্রেম ভরে;
প্রভাত বায়ু, উত্তেজিয়া স্নায়ু,
বাড়াইয়া আয়ু বহে ধীরে ধীরে।

ফুটন্ত ফুলে, ভ্রমর দোলে,
গুণ্ গুণ্ রোলে কার গুণ রটে ;
ডালে বসি পাখী, সুললিত ডাকি,
বলে "মেল আঁখি, সুপ্রভাত বটে।

গাহিতে গাহিতে তিনজনে তপোবন হইতে বহির্গত হইয়া শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দূর হইতে শ্রুত হইতে লাগিল, তাঁহারা গাহিতেছেন—

শিশির ফোটা, মুকুতা ছটা,
শোভিত পাতা, কিবা মন হরে ;
সহজেই রসনা, শিখাতেও হলোনা,
করে নাম রটনা "হরে হরে হরে।"

ক্রমে ক্রমে দূর হইতে দূরান্তরে শব্দ মিশাইয়া গেল।

অনেক বেলা পর্য্যন্ত কেহই ইহাঁদের আর কোন সন্ধান পাইল না। প্রায় দশ ঘটিকার সময় শান্তিপুর হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গাতীরের পথে ইহাঁদিগকে আবার দেখা গেল। অগ্রে সত্যানন্দ পশ্চাতে সত্যসখা ও শান্তিপ্রিয়। শান্তিপ্রিয় বালক, সুতরাং ক্ষুধায় বড়ই কাতর হইয়া সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা সত্যানন্দ! কোথায় গিয়া আমরা আহার পাইব ?"

সত্যানন্দ পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত উত্তর দিলেন, "তাহা আমি জানিনা। যিনি যেখানে আমাদের আহারের আয়োজন করিয়াছেন, আমরা সেইখানেই আহার পাইব।"

শান্তিপ্রিয় বলিল, "আমার যে বড়ই ক্ষুধা হইয়াছে!"

সত্যানন্দ কহিলেন, "তবে যদি কাছে খাবার চাও।"

শান্তিপ্রিয় বাল্যস্বভাবসুলভ সরল ভাবে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চাহিলেই কি খাবার পাইব ? এই গঙ্গাতীরে মাঠের মধ্যে মা কেমন করিয়া খাবার দিবেন ?"

সত্যানন্দ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "চাহিলেই পাওয়া যাইবে ইহা নিশ্চয়, তবে এই মাঠের মধ্যে মা কেমন করিয়া খাবার দিবেন, তাহা নরলোকে কি দেবলোকে কেহই জানেনা।"

সত্যসখা জিজ্ঞাসা করিল, "মহর্ষি যে অন্নবস্ত্রের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তবে এখন শান্তিপ্রিয় কিরূপে প্রার্থনা করিবে ?"

সত্যানন্দ উত্তর দিলেন, "এ কথা যদি প্রাণের সঙ্গে বুঝিয়া থাক তবে আর প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা নাই। নিশ্চিন্ত মনে চল, উপযুক্ত সময়েই অন্নপূর্ণা অন্ন দান করিবেন।"

সত্যসখা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদা ! মহর্ষি ত অন্নবস্ত্রের জন্য প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন ; কিন্তু কত হাজার হাজার নরনারী ত ধন, মান, পুত্র প্রভৃতির জন্য লালায়িত হইয়া নিরন্তর কত পূজা, হোম, বলি এবং নানাবিধ কঠোর তপস্যা করিতেছে ? শুনিয়াছি, দুর্গা প্রভৃতি ঠাকুরের কাছে সকলেই "ধনং দেহি মানং দেহি" ইত্যাদি বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকে, এবং দেখিয়াছি, কত মন্দিরে, মসজিদে, বৃক্ষশাখে নানাবিধ সাংসারিক সুখ কামনা করিয়া কত লোকে প্রস্তর বা ইষ্টক খণ্ড ঝুলাইয়া রাখে, তবে এ সকলের মানে কি ?"

সত্যানন্দ উত্তর দিলেন, "লোকে এরূপ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ও সব সকাম প্রার্থনাকে শাস্ত্রে উপদেষ্টাগণ বড়ই

নিন্দা করিয়াছেন। যে সকল অসার সাংসারিক সুখে মত্ত হইয়া মানবে পরম জ্ঞানময় শান্তিদাতা ভগবানকে হারায়, এবং সেইজন্যই যে সকল পদার্থকে সাধুগণ বিষ্ঠামূত্রবৎ ঘৃণা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, সেই সকল অসার বস্তুর জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা বড়ই ইতরের কার্য্য। তুমি সংসার-ক্ষেত্রে নিয়মিত রূপে পরিশ্রম কর, জীবনদাতা দেবতা বিনা প্রার্থনায় তোমার জীবন ধারণের উপযুক্ত আহারাদি তোমাকে প্রদান করিবেনই করিবেন। তবে যদি ব্রহ্মচরণে কিছু প্রার্থনার বস্তু থাকে, সে একমাত্র ভক্তি। ভক্তবৎসলের চরণে সাধুগণ এক বিন্দু ভক্তিরই জন্য চিরদাস হইয়া পড়িয়া আছেন। দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মর্ষি শুকদেব এবং রাজর্ষি জনক এই দেবদুর্লভ ভক্তিরই জন্য কেবল প্রার্থনা করিতেন। নতুবা অন্য কোন সাংসারিক বিষয় ভ্রমেও তাঁহাদের মনে স্থান পাইত না।

বালক শান্তিপ্রিয় উৎসাহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদা! যে ধ্রুবের নাম তোমরা গানে, উপাসনায়, বক্তৃতায়, বার বার উচ্চারণ কর, সেই ধ্রুব ত অসার সাংসারিক ধন, মান, অথবা রাজ্যলাভের জন্যই হরিচরণ সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রার্থনা ত সম্পূর্ণ সকাম; তবে তাঁহার মত হইবার জন্য তোমরা ভগবানের চরণে শত সহস্রবার প্রার্থনা কর কেন?"

সত্যানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "অবোধ বালক! পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুব প্রথমে রাজ্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন সত্য বটে, কিন্তু তিনি যেরূপ পূর্ণ বিশ্বাস, ব্যাকুলতা, অনুরাগ ও ভক্তির সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমরা সেই বিশ্বাস, ব্যাকুলতা

এবং ভক্তিরই জন্য প্রার্থনা করি। নতুবা, ধ্রুবের উদ্দেশ্য যে রাজ্যলাভ, তদ্বিষয় জন্য আমরা ধ্রুবকে প্রশংসা করি না। তবে অবোধ শিশু বলিয়া দোষ মার্জ্জনীয়।”

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা এক প্রকাণ্ড গ্রামের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের ভিতরে বহুলোকের নিবাস, গঙ্গার তীরে নানাবিধ দোকান এবং গঙ্গার ঘাটে বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, পুরুষ প্রভৃতি শত শত লোক স্নান করিতেছেন। তদ্দর্শনে সত্যানন্দ শান্তিপ্রিয়কে মধুর বচনে কহিলেন, “শান্তিপ্রিয়! এত দোকানে এত মিষ্টান্ন ও নদীতে এত জল থাকিতে কি করুণাময়ী আমাদিগের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করিবেন না? যাহা হউক, এই খানে স্নান করিয়া উপাসনা আরম্ভ করি, তাহার পরে মা যাহা করেন, তাহাই হইবে।” এই বলিয়া তিন জনে স্নান করিতে গঙ্গার জলে অবগাহন করিলেন তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং নবীন সন্ন্যাসীবেশে মুগ্ধ হইয়া কত শত নরনারী তাঁহাদিগের প্রতি অবাক্ হইয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। স্নানান্তে অদূরে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহারা মাধ্যাহ্নিক উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

সত্যসখা ও শান্তিপ্রিয় একতন্ত্রী বীণাসংযোগে ঝিঁঝিট রাগিণীতে সঙ্গীত আরম্ভ করিল—

হরি নাম অমূল্য নিধি হৃদয় পরশ মণি,
আছে যার কণ্ঠে গাঁথা সে হয় পরম ধনে ধনী।

গান আরম্ভ করিতে না করিতেই অগণ্য নরনারী সেই দিকে ছুটিয়া আসিলেন। তাহারা গাহিল—

সকল শাস্ত্রের সার, ভক্তের জীবনাধার,
হরি নাম কল্পতরু অনন্ত রত্নের খনি।

এক জন বৃদ্ধ বৈষ্ণব কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিলেন। এবং অন্যান্য সকলে দল বাঁধিয়া ভক্তিভরে "হরিবোল" দিতে লাগিলেন। বালকদ্বয় গাহিল—

যাহার পরশে হয়, সব দিক স্বর্ণময়,
হরিদাস হরি ভ'জে হলেন ভক্ত শিরোমণি।

এক জন প্রাচীন লোক বলিয়া উঠিলেন, "আহা! এমন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ছবি ত কখনও দেখি নাই। এ যে প্রাণোন্মাদিনী ছবি!"

এক জন পট্টবসনপরিধানা প্রাচীনা বিধবা স্নানান্তে হরিনামের মালা জপিতে জপিতে আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন," "আহা, তাইত! আমাদের দেশে হরিনামের এত ছড়াছড়ি হয়, কিন্তু এমন চমৎকার হরিনাম ত কখনও শুনি নাই!" বালকেরা গাহিল—

সকুল শাস্ত্রের সার, ভক্তের জীবনাধার,
হরি নাম কল্পতরু অনন্ত রত্নের খনি।

একজন দোকানদার এক চুবড়ি বাতাসা আনিয়া "হরিবোল" বলিয়া "হরিলুট" দিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। গ্রামের যত বালকবালিকা "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে বলিতে তাহা কুড়াইয়া খাইতে লাগিল। সত্যানন্দ দেখিলেন, মহা ব্যাপার, উপাসনা হয় না। সুতরাং তিনি উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন। বালকদ্বয়ও নাচিতে নাচিতে গাইতে লাগিল। তাহাদের মধুর গান ও মধুর নৃত্যে উপস্থিত অনেক বৃদ্ধ দুই বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন। সেই প্রাচীনা বিধবা আসিয়া শান্তিপ্রিয়কে কোলে

তুলিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণব সত্যানন্দের পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক চীৎকারবরবে কাঁদিতে লাগিলেন। আর এক জন প্রাচীনা বিধবা দুই ছড়া বেলফুলের মালা এবং চন্দন আনিয়া সত্যসখা ও শান্তিপ্রিয়কে সাজাইয়া দিলেন এবং দুইজনকে দুই ক্রোড়ে লইয়া কতকগুলি মিষ্টান্ন প্রদান করিলেন। অচিরেই চারিদিকে প্রচারিত হইয়া গেল যে, কোথা হইতে এক জন যুবক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দুইটী অপূর্ব্ব বালক আসিয়াছে, তাহাদের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে এবং মনমুগ্ধকর হরিনামগানে সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে। এই সংবাদ শ্রবণে তথাকার প্রধান জমিদার রাজীবলোচন উক্ত সন্ন্যাসীদিগকে নিজ ভবনে লইয়া যাইবার জন্য দুই জন অনুচর পাঠাইয়া দিলেন। অনুচরদ্বয় আসিয়া নমস্কার পূর্ব্বক সত্যানন্দকে নিবেদন করিল, "মহাত্মন্! এই গ্রামের জমিদার মহাশয় অদ্য আপনাদিগকে তাঁহার ভবনে গিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।"

সত্যানন্দ তাহাদিগকে প্রতিনমস্কার করিয়া কহিলেন, "আমরা কাঙ্গাল হরিদাস, যিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, আমরা আনন্দ অন্তরে তাঁহারই ভবনে গিয়া দয়াময়ের নাম গুণ কীর্ত্তন করিব। আপনাদিগকে অত কুণ্ঠিত হইতে হইবে না। চলুন, আমরা আপনাদিগের ইচ্ছামত আপনাদিগের সঙ্গে গমন করি।" এই বলিয়া হরিনাম গান করিতে করিতে তিন জনে তাহাদিগের সঙ্গে জমিদারভবনের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তথাকার প্রায় সমুদায় লোকই তাঁহাদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন।

জমিদারভবন রাজভবনের ন্যায় অতি সুন্দর। উন্মত্ত সন্ন্যাসী সত্যানন্দ হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া গান করিতে করিতে প্রশস্ত গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুব-প্রহ্লাদের ন্যায় বালকযুগলও আসিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই গ্রামস্থ লোকসমাগমে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। জমিদার রাজীব-লোচন সেই জনতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমি এই গ্রামস্থ সমুদায় অধিবাসীর প্রতিনিধি হইয়া এই তিন জন মহাত্মাকে নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে, উহাঁরা অদ্য এই গ্রামে পদার্পণ পূর্ব্বক হরিগুণ কীর্ত্তনে আমাদিগকে যে কি পর্য্যন্ত শান্তি প্রদান করিলেন, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। যদি দয়া করিয়া এখানে আসিয়াছেন, তবে আমার একান্ত বাসনা যে, অদ্য মধ্যাহ্ন কালে এই অধমের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সকলকে বাধিত করেন।"

তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে সত্যানন্দ দণ্ডায়মান হইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনাদিগের দয়া ও আদরে আমরা যে কত দূর প্রীতিলাভ করিয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। ভক্তবৎসল ভগবানের নামে আপনারা যেরূপ চমৎকার ভক্তি প্রকাশ করিলেন, তাহাতেই আমাদিগকে একেবারে কিনিয়া লইয়াছেন। আমাদের বলিবার আর কোন কথাই নাই। আপনাদের যেরূপ অভিরুচি সেইরূপই কার্য্য হউক।" তাঁহার এই কথা শ্রবণে সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এবং একে একে উপস্থিত সমুদায় লোকই তাঁহাদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক ক্রিদয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী নিজে পদপ্রক্ষালনের জল আনিয়া দিলেন।

সন্ন্যাসীরা তাহা গ্রহণ না করিয়া অন্য জলে পদধৌত করিয়া সুন্দর আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

যথাকালে গৃহস্বামিনী জমিদারপত্নী নিজ হস্তে স্বর্ণথালে নানাবিধ উপাদেয় অন্ন ব্যঞ্জন আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে দিলেন। সত্যসখা বালক, সে হঠাৎ বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! আপনি কি অন্নপূর্ণা?"

গৃহস্বামিনী লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "সে কি বাছা, আমি মহা পাতকিনী, আমি অন্নপূর্ণা কেন?"

সত্যসখা বলিল, "যদি আপনি অন্নপূর্ণা না হয়েন, তাহা হইলে আমরা আপনার হস্তের অন্ন আহার করিতে পারি না। গুরুদেব আমাদিগকে অন্নপূর্ণা বিনা অন্য কাহারও অন্ন গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "সত্যসখা! তুমি বালক, এখনও অন্নপূর্ণাকে চিনিতে পার নাই। অন্নপূর্ণা বিনা এই অপরিচিত দেশে এই মধ্যাহ্ন সময়ে এত আদর করিয়া রাজপ্রাসাদের উপর স্বর্ণথালে এত উপাদেয় রাজভোগ আমাদিগের মত পথের কাঙ্গালকে কে দিতে পারে বল? যিনি আমাদিগকে অন্ন দিলেন ইনিই অন্নপূর্ণা, ইহাঁকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া অন্নগ্রহণ কর।'

সকলে প্রণাম পুরঃসর ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন; সত্যসখা ভোজন বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! অন্নপূর্ণা ত নিরাকারা দেবী, যিনি অন্ন দিলেন ইনি যে সাকারা?" সত্যানন্দ বলিলেন, "তুমি বাহিরের মানুষকে দেখিতেছ কেন? ইহাঁর বক্ষের ভিতরে করুণা, স্নেহ, ও প্রেম রূপে যিনি আছেন তিনি সাকারা নহেন। মানুষের ভিতরে দেবতার প্রকাশ

তাহা কি জান না? দেবতা যিনি তিনি কখনও স্বতন্ত্র আকারে কোথাও প্রকাশিত হয়েন নাই। প্রকৃতির ভিতর দিয়াই তিনি চিরকাল সহস্র হস্তে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। সেই জন্যই ভারতে প্রকৃতি-পূজার এত ছড়াছড়ি। নরের ভিতরে পিতারূপে এবং নারীর ভিতরে মাতারূপে ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত।”

কথায় কথায় সকলেই ভোজন বন্ধ করিলেন। সত্যসখা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবান সকল সময়েই কি নরনারীর ভিতরে প্রকাশিত আছেন?” সত্যানন্দ উত্তর দিলেন, “বায়ুমণ্ডলের মত অব্যক্ত ব্রহ্মশক্তি সকল সময়েই মানবাত্মায় অনুপ্রবিষ্ট আছেন, কিন্তু সে অবস্থায় কেহই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। সময়ে সময়ে বিশেষ কারণ বশতঃ যখন অব্যক্ত ব্রহ্ম ব্যক্ত হয়েন, তখনই সাধক তাঁহাকে বুঝিতে পারেন; কিন্তু সাধারণ লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারে না। তাহারা মানুষের ভিতরে কেবল মানুষই দেখে।”

সত্যসখা আবার জিজ্ঞাসা করিল, “মানবাত্মার ভিতরে যদি ভগবানই রহিলেন, তবে সময়ে সময়ে মানব এত পশুর মত আচরণ করে কেন?” সত্যানন্দ উত্তর দিলেন, “যে সময়ে পরমা শক্তি আত্মার মধ্যে অস্ফুট থাকেন, তখন মানব তাঁহার ইচ্ছার পরিবর্ত্তে নিজ ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। মানবের স্বাধীন ইচ্ছা সকল সময়ে ভালমন্দ বিচার করিতে না পারায় এই সব পশ্বাচার পরিদৃষ্ট হয়।”

সত্যসখা আবার জিজ্ঞাসা করিল, “ভগবান মানুষকে

এত স্বাধীন ইচ্ছা কেন দিলেন?” সত্যানন্দ উত্তর দিলেন, “সেকথা ভগবানই জানেন। না দিলে বোধ হয় লীলাময়ের লীলাপ্রকাশে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। স্বাধীনতা না পাইলে বোধ হয় মানবাত্মা স্নেহ, প্রীতি, বিশ্বাস ও ভক্তি প্রভৃতি উজ্জ্বল দেবভাব সকল হইতে চিরবঞ্চিত হয়। শ্রীহরির এই বিচিত্র লীলা কেহই বুঝিতে পারে না। যোগী, তপস্বী, সাধু, জ্ঞানী, পণ্ডিত, সকলেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।”

এমন সময়ে গৃহস্বামিনী বলিলেন, “বাছা, তোমরা আহার কর, বেলা অনেক হইয়াছে। আহারান্তে ওসব কথা হইবে।” সত্যানন্দ ভাবে বিভোর হইয়া বিশ্বজননীকে বলিলেন, “আহা মা! তোমার কতই দয়া! আমাদিগকে ধন্য করিলে। আজ তোমার হাতে অন্ন আহার করিয়া আনন্দে তোমার নাম গান করিব। শান্তিপ্রিয়! যেমন ক্ষুধাতুর হইয়াছিলে, তেমনই মা অন্ন দিয়াছেন ত? এখন আনন্দে মার নাম গান করিয়া ভোজন শেষ কর।” এই বলিয়া সত্যানন্দ ধীরে ধীরে গাহিলেন, “মা আমার আনন্দময়ী আনন্দে করেন প্রসাদ বিতরণ। মা আপনি রাঁধেন, আপনি বাড়েন, আবার আপনি করেন পরিবেশন। মায়ের হাতে আজ করিয়া ভোজন, (পঞ্চামৃত পরমান্ন) করিব সকলে নাম সঙ্কীর্ত্তন, বলিব আনন্দে ভরিয়া বদন, মায়ের নামে হয় অসাধ্য সাধন;—” গাহিতে গাহিতে আর গাহিলেন না। নীরবে সকলে ভোজন করিতে লাগিলেন।

আহারান্তে জমিদার রাজীবলোচন সত্যানন্দকে অনেক

বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আনন্দ-আশ্রম, আশ্রমস্থ নর-নারীগণ এবং প্রবোধচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। বৈকালে রাজীবলোচন যত্নপূর্ব্বক শকটারোহণে সন্ন্যাসী-দিগকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মাতা ও পুত্র।

হরি হে! তুমি স্পর্শমণি! তুমি একবার যাহাকে স্পর্শ কর, সে আর সংসারের ঘৃণিত পাপীর মত কৃষ্ণবর্ণ থাকে না। দেখিতে দেখিতে সে স্বর্গীয় লাবণ্যে পরি-শোভিত হয়। এত যে নীচ হৃদয়, এত যে পামর মন, এত যে পাষাণ প্রাণ, কিন্তু তুমি যদি একবার এক নিমিষের জন্যও স্পর্শ কর, আমার সমুদায় কলঙ্ক চিরকালের মত চলিয়া যায়। তোমার মহিমা বুঝে কে! বড় বড় দৈত্য দানবকে তুমি একবারমাত্র স্পর্শ করিয়া বশীভূত কর। তাই সাধুগণ ভক্তগণ দিবানিশি তোমার নাম কীর্ত্তন করেন। কেননা, বারবার ও নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নামের ভিতরে একবার তোমার স্পর্শ লাভ করিলেই উদ্ধার লাভ করিবেন। তোমার স্পর্শে মৃত্তিকা স্বর্ণ হয়, ভস্ম রত্ন হয়, অঙ্গার মাণিক হয়, পাষাণ জল হয় এবং মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত হয়। ইহা কল্পনা নয়, কবিতা নয়, জীব নয়, ছায়া নয়, কিন্তু অর্দ্ধ সত্য। জগাই মাধাই,

যাহাদের তুল্য দানব দেশে আর ছিল না, তাহাদিগকে একবারমাত্র কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে স্পর্শ করিলে, আর তাহারা দানবত্বের আবরণ পরিত্যাগ করিয়া দেবভূষণে বিভূষিত হইল। দুরাত্মা সকল, কি ভয়ানক ব্যাপারই করিয়া বেড়াইতেছিল, তুমি পুণ্যময় হরি, একবার ছুঁলে, আর সে স্বর্গীয় চরিত্র লাভ করিয়া দেবদূত হইয়া গেল। রত্নাকর দুর্দ্দান্ত দস্যু, তুমি একবার তাহার গায়ে হাত দিলে, আর অমনই সে সাধু শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি ঋষি হইল। আমাদের প্রবোধচন্দ্র দৈত্য ছিল, তুমি একবার তাহার হাত ধরিলে, অমনই সে দেবশ্রী লাভ করিল। যে পিতা রমেশচন্দ্র যে পুত্র প্রবোধের জন্য অহর্নিশি মনস্তাপে অনুতাপে জর্জ্জরিতপ্রাণ ছিলেন, সেই পিতা আজ সেই পুত্রের সঙ্গলাভে আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছেন। যে মাতা কমলিনী যে প্রবোধের অত্যাচারে অনাচারে এবং তিরস্কারে মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ এবং শান্তিহারা ছিলেন, সেই মাতা আজ সেই পুত্রের সেবায়, ভক্তিতে এবং ধর্ম্মপরায়ণতায় একেবারে কুসুমভারে অবনতা লতিকার ন্যায় বিমুগ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন। যে প্রতিবাসীগণ যাহার দুর্ব্ব্যবহারে নিতান্তই উৎপীড়িত ছিলেন, এখন সেই প্রতিবাসীগণই তাহারই অপূর্ব্ব ভাবে বশীভূত হইয়াছেন। প্রবোধ এই কয়েকদিনের মধ্যেই সকলেরই হৃদয় ও মন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। হরিভক্তির আশ্চর্য্য গুণই এই যে, তাহা শিষ্ট অশিষ্ট আত্মীয় অনাত্মীয় সকলকেই বশীভূত করে। ধ্রুব যখন মধুবনে হরিভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তখন কথিত আছে, সিংহ

শার্দ্দূলাদি বন্য পশুও বিমোহিত হইয়া বালক ধ্রুবের কোন অনিষ্ট করে নাই। প্রহ্লাদ যখন দৈত্যপুরীতে হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন, তখন ঘাতক, চণ্ডাল, অসুর-বালকবালিকাগণ, পুরবাসী ও পুরবাসিনীগণ, এমন কি সময়ে সময়ে মহাপাষণ্ড পাষাণহৃদয় হিরণ্যকশিপু পর্য্যন্তও মুগ্ধ হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ যখনই যে দেশে যাইতেন, তখনই সে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। এই বর্ত্তমান সময়ে নববিধান প্রচারকগণ যখনই যেখানে গিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তখনই সেখানে তাহাদিগের চমৎকার হরিভক্তি ও ভাবে সকলেই মোহিত হইয়াছেন। হরি হে! তোমার নামের অপার মহিমা!

আহারান্তে মাতা কমলিনী নিজ শয়নমন্দিরে শয়ন করিয়াছেন এবং পুত্র প্রবোধচন্দ্র তাঁহার পদমূলে বসিয়া পদসেবা করিতেছে। পুত্রবাৎসল্যে মাতা মুগ্ধা এবং মাতৃভক্তিতে পুত্র গদগদ। উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। মাতা দেখিতেছেন, এ দুঃখময় সংসারে পুত্ররত্ন কি অপূর্ব্ব আদরের পাত্র! এবং পুত্র দেখিতেছে, এ পাপময় পৃথিবীতে মাতৃমূর্ত্তি কি স্বর্গীয় দেবিপ্রতিমা! মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্রকে, "বাবা প্রবোধ! তুমি আমাকে প্রহার করিয়া টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছিলে, তাহার জন্য কি এখন তোমার মনে দুঃখ হয়?" পুত্র উত্তর দিল, "মা! সে কথা আর তোমাকে কি বলিব বল! অন্তর্য্যামী দেবতা যিনি তিনিই সে মর্ম্মব্যথা জানেন।

ঋষিগণের সঙ্গগুণে যেদিনে হৃদয়ে প্রথম অনুতাপের অগ্নি জ্বলিয়াছিল, সেদিনে আমি আত্মকৃত পাপরাশি স্মরণ করিয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। এবং যেন দেখিতে লাগিলাম, আমার পাপভারে বসুন্ধরা চঞ্চলা হইয়াছেন, মৃত্যু যেন দণ্ড তুলিয়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে, পাপী বন্ধুগণ যেন আমার সম্মুখে গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, রাক্ষসী সুরা যেন আমাকে অগ্নিবৎ দগ্ধ করিতে আসিতেছে! আর বলিতে লজ্জা হয়, যে সকল রমণীর সতীত্ব হরণ করিয়াছিলাম, তাহারা যেন আমার কেশ ধরিয়া ভীষণ সমুদ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। তাহার পর যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা বলিতে বুক ফাটিয়া যায়। উঃ। সে দৃশ্য কি জীবনে কি মরণে কখনও ভুলিতে পারিব না।” বলিতে বলিতে প্রবোধ কাঁদিয়া ফেলিল।

কমলিনী উপবেশন পূর্ব্বক প্রবোধকে নিজ ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক অঞ্চলে চক্ষুজল মুছাইয়া বলিলেন, “থাক্ বাছা। থাক্, আর সে কথায় কাজ নাই। অভাগিনী আমি মিছামিছি তোমাকে কাঁদাইলাম।” কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবোধ বলিল, “না মা! তুমি অভাগিনী নও, তুমি স্বর্গের দেবী, আমি নিতান্ত পামর, না বুঝিয়া তোমাকে কতই কষ্ট দিয়াছি। শোন মা! তোমার অভাগা প্রবোধের অনুতাপের কথা শোন। তোমাকে বলিলেও আমি কতকটা শান্তিলাভ করিব।” এই বলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, “তাহার পর দেখি-

লাম মা! তুমি আলুলায়িত কেশে কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানে উপস্থিত হইয়াছ। তোমার পরিধানের বসন ছিন্ন ভিন্ন ও মলিন, সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত এবং নয়নযুগল রক্তবর্ণ, আবার তাহা হইতে বর্ষার ধারার ন্যায় অজস্র ধারে অশ্রুবর্ষণ হইতেছে। উন্মাদিনী বেশে মা তুমি আমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছ। আমি তোমার পায় ধরিয়া তোমাকে কত সান্ত্বনা করিলাম, সাধুসঙ্গে আমি অসাধুভাব পরিত্যাগ করিয়াছি বলিলাম, এবং তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া তোমাকে আর প্রহার করিব না বলিয়া শপথ করিলাম। তাহার পর দেখি পিতা স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকেও ঐরূপে কত স্তুতি মিনতি করিলাম।" ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া প্রবোধ কমলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! আমার সমুদায় অপরাধ কি ক্ষমা করিবে না?" মা শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক বলিলেন, "সে কি বাছা, মা কি কখনও সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করে? পরমমাতা দেবী ভগবতী তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, তোমার আর ভয় কি বাবা?"

প্রবোধ বিষণ্ণভাবে বলিল, "আর কোন ভয় নাই সত্য, কেননা ভয়হারিণী বিশ্বজননী আমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে স্থান দিয়াছেন। তিনি এমনই করুণাময়ী যে, সেদিনে আমার ঐ সব ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দেখিয়াই আমার কোটি অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। সেদিন হইতে আমি তাঁহার সহবাসে নিত্য নূতন নূতন আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। কিন্তু মা!

যখনই পুরাতন কথা মনে পড়ে, তখনই প্রাণ একেবারে ফাটিয়া যায়। এই পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত না হইলে যে আর কোন মতেই নিস্তার নাই!" কমলিনী এ কথার কি উত্তর দিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সাধন ভজনের কথা তিনি কিছুই জানেন না। তিনি এইমাত্র বলিলেন যে, "তোমার গুরুদেব যোগানন্দকে সময় মতে একথা জিজ্ঞাসা করিও।" কথাটী প্রবোধের প্রাণে লাগিয়া গেল। যোগানন্দ ভিন্ন ইহার উপায় কেহই করিতে পারিবে না। পিতামাতা বল, স্ত্রীপুত্রকন্যা বল, সাধু বিনা গুরু বিনা পাপরোগের ঔষধ কেহই জানেন না। অনুতপ্ত হৃদয়ের তাপাগ্নি নিবাইয়া শান্তি-সলিল ঢালিতে সাধু বিনা আর কেহই পারেন না। এইজন্যই বুঝি পৃথি-বীতে সাধু গুরুর সৃষ্টি। গুরু মানেন না এমন কোন জাতি এ জগতে নাই। গুরু বা শিক্ষকের আবশ্যক হয় না এমন সমাজের কথা কেহ কখন শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু গুরু মানিব বলিয়াই যে, মূর্খের ন্যায় গুরুকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করিব, তাহা নহে। গুরুর আবশ্যকতা আছে বলিয়াই যে, যে কোন একজন বেশধারী ভণ্ড, নিরক্ষরা স্ত্রীলোক অথবা দুগ্ধপোষ্য বালকের পদধূলি মস্তকে মাখিব, তাহা নহে। গুরু যদি মানিতে হয়, তবে জনক, নারদ, শিব, শুক, শাক্য প্রভৃতিকে মানিব। গুরু যদি মানিতে হয়, তবে দাউদ, যোহন, ঈশা, পল প্রভৃতিকে মানিব। গুরু যদি মানিতে হয়, তবে শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, তুলসী, রামপ্রসাদ, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ

প্রকৃতিকে মানিব? গুরু যদি মানিতে হয়, তবে বিশ্বাসী ভক্ত নিঃস্বার্থ উপদেষ্টাকে মানিব। মহর্ষি যোগানন্দ জ্ঞানী বিশ্বাসী ও ভক্ত, হরিপ্রেমরসে চিরমগ্ন, সাংসারিক কোন ভাব তাঁহার বিমল হৃদয়ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইতে পায় না। যোগানন্দের শান্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিলে ত্রিতাপ জ্বালায় তাপিত প্রাণ স্নিগ্ধ হয়। প্রবোধের প্রাণ তাঁহার মধুর উপদেশে জুড়াইয়া গিয়াছে, তাই প্রবোধ জাতি কুল বিচার না করিয়াই তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়াছে। গুরুভক্তিতে প্রবোধ অজ্ঞান। মাতৃমুখে গুরুর কথা শুনিয়াই প্রবোধ একটু চঞ্চল হইল। মনে মনে স্থির করিল. শীঘ্রই গুরুদর্শনে যাত্রা করিবে। মনে যাহা উদয় হইল, মুখেও তাহাই ব্যক্ত হইল। প্রবোধ জননীকে বলিল, "মা! আপনি আমার গুরুদেবের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বড়ই উপকার করিলেন। অনেক দিন হইল তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করি নাই। এক্ষণে যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই একবার "আনন্দ-আশ্রমে" ঋষিগণকে দর্শন করিতে যাত্রা করি।"

কমলিনী পুত্রের এ প্রস্তাবে বাধা দেওয়া উচিত বিবেচনা করিলেন না। যাঁহাদের সঙ্গগুণে প্রবোধ সমুদায় পাপ পরিত্যাগ করিয়াছে, যাঁহাদের মধুর উপদেশে প্রবোধের উন্মার্গগামী মন স্থিরভাব ধারণ করিয়াছে, এবং যাঁহাদের অনুগ্রহে প্রবোধ হরিনামরত্ন লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে যাওয়া প্রবোধের নিতান্তই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা ভাবিয়া কমলিনী বলিলেন, "বৎস! তুমি

সাধুদিগকে দর্শন করিতে যাইবে, ইহাতে আমার অমত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আনন্দই হইতেছে। আহা! তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেও পুণ্য হয়। তোমার অসদ্ব্যবহারে আমার চিরকালের আশাভরসা গঙ্গার জলে ডুবিতেছিল, কেবল তাঁহাদেরই দয়া ও আশীর্ব্বাদে তোমার জীবন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে। যাও বৎস! আবার কিছুকাল তাঁহাদের আশ্রমে থাকিয়া সদ্‌গুণ উপার্জ্জন কর। আমি প্রসন্নমনে তোমাকে অনুমতি দিতেছি। আহা, প্রবোধ! যদি কোন উপায় থাকিত তবে আমিও একবার তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিতাম।"

কমলিনীর কথা শুনিয়া প্রবোধ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "মা! তুমি যাহা যাহা বলিলে সকলই সত্য। তাঁহাদিগের সঙ্গ না পাইলে আমি কখনই এই নবজীবন লাভ করিতে পারিতাম না। আহা! এ সংসারে তাহারাই বাস্তবিক অন্ধকার পথের উজ্জ্বল আলোক। তাহাদের চিরপ্রফুল্ল সুন্দর মুখশ্রী দর্শন করিলে পুত্রশোকাতুরা জননীর প্রাণেও একটু শান্তি হয়।"

কমলিনী। আচ্ছা প্রবোধ! শুনিয়াছি, তাঁহারা নাকি ব্রাহ্মণ নহেন, অন্য কোন নীচ জাতি; তবে তাঁহাদিগকে গুরু করিয়াছ, ইহাতে সমাজে কোন দোষ হইবে না ত?

প্রবোধ। মা! আজ কালকার সমাজের কথা ছাড়িয়া দেও। ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, তাহাই কেহ জানে না। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিলে এবং গলায় পৈতা ধারণ করিলেই

ব্রাহ্মণ হয়, বর্ত্তমান সমাজের ইহাই ধারণা। পূর্ব্বকালের শাস্ত্রকারগণ কিন্তু এরূপ বলেন না। তাঁহারা নিরবলম্ব উপনিষদে বলিয়া গিয়াছেন, "যো ব্রহ্মবিদ্ স এব ব্রাহ্মণঃ।" ইহার অর্থ, যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বরকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। আজকালকার ব্রাহ্মণগণ কিন্তু ব্রহ্ম নাম শুনিলেই ভয়ে চমকিয়া উঠেন। ব্রহ্মকে যে জানা যায়, বুঝা যায়, দেখা যায়, একথা তাঁহারা কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যে সকল লক্ষণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাদের একটী লক্ষণও ইহাঁদের নাই। মহাভারতে ব্রাহ্মণের যে সকল গুণের কথা লিখিত আছে, তাহাদের এক একটীর অর্থও বোধ হয় ইহাঁরা জানেন না। শাস্ত্রমতে বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণদিগকে শূদ্র বলাই উচিত, এবং যে সকল শূদ্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, সাধন ভজন করেন, ভক্তিপরায়ণ এবং সর্ব্বজীবে দয়াশীল, তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলা উচিত। কেননা, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং। ক্ষত্রিয়া জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাত্তথৈব চ॥" ইহার অর্থ এই যে, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে সেই ব্রাহ্মণ হইবে, এবং ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কেহ নিকৃষ্ট কার্য্য করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শূদ্র হইবে।

কমলিনী। আহা প্রবোধ! এ সকল বড়ই চমৎকার কথা। শাস্ত্রে যদি এ সব লেখা আছে, তবে দেশের লোকে এ মতে চলে না কেন জানি না! দেখ, শুদ্ধ লোকে যখন

এ মতে চলে না, তখন তুমি একাকী কিরূপে এ মতে চলিবে?

প্রবোধ। ভয় কি মা? ভগবান যে আমার সহায়! বিশেষতঃ আজ কাল একটী সমাজ স্থাপন হইয়াছে, তাহার নাম ব্রাহ্মসমাজ, সেই সমাজে এই সব মত চলিয়া থাকে। আমার গুরুদেব যোগানন্দ এবং আশ্রমস্থ অন্যান্য সাধুগণ এই দলের মতভুক্ত।

কমলিনী চমকিতা হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মসমাজ? ওরা ত খৃীষ্টিয়ান! ওরা জাতি মানে না, যাহার তাহার সঙ্গে ছেলেমেয়ের বিবাহ দেয়, মদ খায়, বিধবাবিবাহ করে। ওরা আবার ব্রহ্মকে জানিবে কিরূপে? আর ব্রাহ্মণই বা হইবে কিরূপে?

প্রবোধ বলিল, "মা! তুমি উহাঁদের সমুদায় সংবাদ জান না। বাহিরের লোকে, তুমি যাহা যাহা বলিলে ঐ রূপই জানে বটে। কিন্তু, আমি জানি, উহাঁদিগের ভিতরে এমন সকল মহাত্মা ছিলেন এবং আছেন, যাঁহাদিগকে প্রাচীন ঋষিমহর্ষিদিগের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। জাতিভেদ প্রথা রহিত করা এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা, ইহা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য বটে, কিন্তু মূলে ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন, সাধন ভজন, ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ, প্রাণপণে জগতের কল্যাণ সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। তবে নানা লোকে নানা উদ্দেশ্যে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার ক্ষতি করিতেছে। এইজন্যই বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের তত উন্নতি হইতেছে না। আর ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াও আজ

কাল অনেক লোক জন্মগ্রহণ করিতেছেন, যাঁহারা জাতি-ভেদ উন্মূলন, বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বাল্যবিবাহ রহিত-করণ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্যোগী। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ও হরিভক্তি উপার্জ্জন না করিলে শুদ্ধ সমাজসংস্কারে দেশের অমঙ্গল বিনা কখনই মঙ্গল হইবে না।

কমলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কাল গ্রামে গ্রামে যে এত হরিসভা স্থাপিত হইতেছে, ইহাতে কি দেশের কোন উপকার হইতেছে না?" প্রবোধ বলিল, "কেন হইবে না? যে সকল যুবক পূর্ব্বে মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে ডুবিয়াছিল, তাহারাই এই সব হরিসভা স্থাপন করিতেছে। সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা বর্ত্তমানে বিশেষ কুকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অল্পই আছে। ইহাতেও দেশের অনেকটা উপকার। কিন্তু এই সব হরিসভার সভ্য-গণ যদি কোন একখানি বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থের মতকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া এবং সমাজের প্রচলিত অনেক কুসংস্কার অনুযায়ী না চলিয়া নিজেদের স্বাধীন চিন্তা ও বিচারশক্তিকে আত্মোৎকর্ষসাধনে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। বিশ্বপিতা পরমেশ্বরের মঙ্গলময় আদেশ সকল ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম সমুদায় সমাজের ভিতরেই ঘোষিত হইতেছে। যে কেহ তাহা বুঝিতে পারেন, তাঁহারই জীবনে উন্নত হইয়া থাকে। জীবনের উন্নতিতেই সুখ ও শান্তি, নতুবা কোন একটা বিশেষ মত অবলম্বন করিলেই যে মুক্তি, তাহা কে বলিল?"

মাতা ও পুত্রে এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে. এমন

সময়ে পরিচারিকা আসিয়া প্রবোধচন্দ্রকে নিবেদন করিল, "মহাশয়! আনন্দ-আশ্রম হইতে দুইটী ঋষিবালক সঙ্গে লইয়া একজন যুবা ঋষি আসিয়াছেন। তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।" শুনিবামাত্র প্রবোধ ব্যস্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং বাহিরে আসিয়া সত্যসখা ও শান্তিপ্রিয় সমেত সত্যানন্দকে দেখিয়া পরস্পর স্বাগত সম্ভাষণ এবং আলিঙ্গনাদি করিলেন। অনেক দিনের পরে পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়ায় সকলেরই মনে এক মহা আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। সত্যসখা ও শান্তি-প্রিয় প্রবোধচন্দ্রকে কত কথা বলিল, প্রবোধচন্দ্রও তাহা-দিগকে কত কথা বলিলেন। সত্যানন্দ প্রবোধকে যোগা-নন্দের আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। মহা আহ্লাদে পরস্পর দিবসত্রয় তথায় অতিবাহিত করিলেন। চতুর্থ দিবসের প্রাতঃকালে প্রবোধ পিতামাতার চরণে বিদায় লইয়া ঋষিদিগের সঙ্গে আনন্দ-আশ্রমে চলিয়া গেলেন। দেব-দূতের মুখে শ্রীহরি প্রবোধচন্দ্রকে গৃহে আগমন পূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার চেষ্টাও হইতেছিল, এক্ষণে সে চেষ্টা কিছুকালের মত স্থগিত থাকিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সাধন-কুটীর।

লোকে বলিয়া থাকে সংসারে থাকিয়া সম্পূর্ণভাবে ধর্ম্মসাধন হয় না। তাহারা ধর্ম্মকে কৌপীন পরাইয়া বনবাসে বিদায় দেয়। ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে বলিলেই মনে হয়, লোকালয় ছাড়িয়া কোন নির্জ্জন বিপিনে অথবা পর্ব্বতকন্দরে গিয়া ফলমূলাশী হইয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। ধর্ম্ম যে মানবের সংসারের শ্রী, গৃহের শোভা, পুত্রকন্যার সৌন্দর্য্য, ইহা তাহারা ভ্রমেও বুঝিতে পারে না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সমাজে ধর্ম্ম-শিক্ষার বড়ই অভাব। আজকাল ধর্ম্ম মানে গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন, প্রাণশূন্য ব্রতানুষ্ঠান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবভোজন, প্রতিমাপূজা এবং ভণ্ডতপস্বীর বেশধারণ। সত্য পথে চলা, প্রাণপণে জীবের সেবা করা, সৎপাত্রে দান করা, সরল বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক যথার্থ শান্তি ও আনন্দ লাভ করা, ইত্যাদি যথার্থ ধর্ম্মাঙ্গ সকল দেশ হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। পিতা পুত্রকে বিদ্যা শিক্ষা দেন মান ও অর্থের জন্য, জ্ঞানের জন্য নহে, মাতা কন্যাকে দুটো কাজ কর্ম্ম শিক্ষা দেন স্বামি গৃহে পাঁচজনের নিন্দাভাজন না হইবার জন্য, নতুবা কন্যা জীবনের সুখ ও শান্তির জন্য নহে। পরিবারে সাংসারিক শিক্ষা আছে, কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা নাই। ধর্ম্মশিক্ষা যে প্রত্যেক শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়

তাহা কেহই বুঝে না। কাজেই সংসার ধর্ম্মের স্থান না হইয়া অধর্ম্মেরই আগার হইয়াছে, শান্তির তপোবন না হইয়া নরকেরই ভীষণ দৃশ্য হইয়াছে। যদি তুমি পুত্র-কন্যাকে বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেও, সৎ আচার্য্যের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য দীক্ষিত করিয়া দেও, দেখিবে তোমার সংসারই বাল্মিকীর তপোবন হইবে, তোমার পল্লীই নৈমিষারণ্য হইবে। সন্তানদিগকে সাংসারিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বকালের ঋষিবৃন্দের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা না দিলে তোমার সংসারের কখনই মঙ্গল হইবে না। দেশে সামান্য বিদ্যালয়ই স্থাপন কর, আর প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠা কর, তপোবন বিনা আশ্রম বিনা ধর্ম্মমন্দির বিনা প্রকৃত কল্যাণ কখনই সাধিত হইবে না।

প্রবোধচন্দ্র শান্তিপুর পরিত্যাগ করিয়া ঋষিদিগের আশ্রমে আসিয়াছেন। মহর্ষি যোগানন্দ তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবেন স্থির করিয়াছেন। সৎসঙ্গে যদিও প্রবোধের জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি ব্রহ্মচর্য্য সাধন বিনা জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হইবে না। প্রবোধের বর্ত্তমান অবস্থা তত আশঙ্কাশূন্য নহে। অনেক লোকে সাধুসঙ্গে মন পরিবর্ত্তন করে বটে, কিন্তু আবার অসাধুসঙ্গে পড়িয়া পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়। যত দিন সাধন পরিপক্ক না হয়, ততদিন সাধু-সঙ্গ পরিত্যাগ করা সাধকের পক্ষে কখনই উচিত নহে। দীন হীন কাঙ্গালবেশে সাধু গুরুর দ্বারে পড়িয়া থাকা সাধক মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। শুকদেব ভিখারীর বেশে জনক রাজার দ্বারে পড়িয়াছিলেন, তাই তিনি অমূল্য ব্রহ্ম-

জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। নারদ ঋষি সাধু বৈষ্ণবের সেবায় অহরহঃ নিযুক্ত ছিলেন, তাই তিনি দেবদুর্লভ হরিভক্তি পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সেইজন্যই যোগ-বাশিষ্টে লিখিত আছে, "ন তপাংসি ন তীর্থানি ন শাস্ত্রাণি জয়ন্তি বঃ। সংসার সাগরোত্তারে সজ্জনাসেবনং বিনা।" অর্থাৎ ভবসাগর পার হইতে গেলে সাধুসেবা ব্যতিরেকে তোমাদের তপস্যাচরণ, তীর্থ গমন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন কিছুই ফলোপধায়ী হইবেক না। যিনি ভবসাগর পার হইতে চাহেন তিনি অনতিবিলম্বে সাধুসঙ্গ অন্বেষণ করুন। সাধু-সঙ্গে অঙ্গার স্বর্ণবর্ণ লাভ করে, সাধুসঙ্গে মাঠের কৃষক মহাপণ্ডিত হয়, সাধুসঙ্গে দস্যু রত্নাকর আদিকবি বাল্মিকী হইয়া যায়। কিন্তু যাহার মনে অহঙ্কার আছে, যে আপনাকে সকলের অপেক্ষা নীচ মনে না করে এবং দীন হীন সনাতনের ন্যায় দন্তে তৃণ লইয়া ভক্তের দ্বারে বসিতে না পারে, তাহার সাধুসঙ্গে কিছুই উপকার হয় না। সেই জন্য ভক্ত কবীর বলিয়া গিয়াছেন, "চন্দন তরু সমূহ ভাল যাহার চারিদিকে পলাশ বৃক্ষ থাকে, কারণ চন্দনের নিকট যে সমস্ত বৃক্ষ থাকে তাহারাও চন্দন হইয়া যায়। বাঁশ যেমন অহঙ্কারে ডুবিয়া থাকে, এরূপ কেহ অহঙ্কারে নিমগ্ন থাকিও না। বাঁশ, চন্দন বৃক্ষের নিকটে থাকে, কিন্তু উহা সুগন্ধিযুক্ত হয় না।" চন্দন তরু মানে সাধু, পলাশ বৃক্ষ মানে বিনীত শিষ্য এবং বাঁশ মানে অহঙ্কারী মনুষ্য। যিনি অহঙ্কার করিবেন তিনিই ঠকিবেন, চন্দনের সান্নিধ্যলাভ হইতে বঞ্চিত হইবেক, এবং যিনি আপনাকে

দীন হীন কাঙ্গাল মনে করিবেন তিনিই জিতিবেন, চন্দনের সুসৌরভে অনুলিপ্ত হইবেন। প্রবোধের প্রাণে কিছুমাত্র অহঙ্কার নাই, ঐ দেখ প্রবোধ দীন হীন কাঙ্গালবেশে মহর্ষি যোগানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছেন। প্রবোধকে দেখিলেই মনে হয় যেন কি একটা মহাবস্তু হারাইয়াছেন, যোগানন্দ তাহার সন্ধান বলিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন, সেইজন্যই অমন কাতর ভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। বাস্তবিকই, হরিধনকে অন্বেষণ করিতে হইলে ধ্রুবের মত ব্যাকুল হইতে হয়, প্রবোধের মত গুরুর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে হয়, নতুবা ইহকালে পরকালে কোথাও সে অসূর্য্যম্পশ্য অমূল্য কহিণূরকে পাওয়া যায় না।

প্রথম দিবস।

যোগানন্দ এবং প্রবোধ এক নিভৃত নিকুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেখানে শীতল পল্লবচ্ছায়া, পবিত্র কুসুমসৌরভ, সুমন্দ সমীরহিল্লোল এবং ললিত বিহঙ্গ-কূজন বিনা আর কিছুই নাই। কুঞ্জের ভিতর উন্নত বেদীর উপর নবলতিকার নব প্রসূনস্তবক ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং চারিদিকে লতায় পাতায় ও পাতায় লতায় জড়াইয়া জড়াইয়া সুন্দর কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। সেই কুটীরের ভিতর সেই বেদীর উপর অজিন আসনে বৃদ্ধ মহর্ষি যোগানন্দ প্রবোধকে উপবেশন করাইয়া বলিলেন, "বৎস! অদ্য হইতে এই নির্জ্জন নিকুঞ্জগৃহ তোমার সাধন-কুটীর হইল। দিবানিশি এইখানে বসিয়া তোমাকে

সাধন করিতে হইবে।" অনুরাগী শিষ্য গুরুপদে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য অদ্য হইতে আমাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়া কৃতার্থ করুন।" যোগানন্দ বলিলেন, "আমি অনন্ত জ্ঞানময়ের রাজ্যে জ্ঞান-হীন তৃণকণা, আমি তোমাকে কি শিক্ষা দিব? জগদ্গুরুর নিকটে অবনত মস্তকে শিষ্যত্ব স্বীকার কর, তিনিই তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। অদ্য এই একতন্ত্রীবীণাসংযোগে কেবল "সত্যং সত্যং সত্যং" এই নাম গান করিতে থাক। ইহার পরে যখন যাহা যাহা করিতে হইবে, ক্রমে ক্রমে তাহা জানিতে পারিবে। আমি এখন চলিলাম।" এই বলিয়া মহর্ষি তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

প্রবোধচন্দ্র একমনে বীণাসংযোগে "সত্যং সত্যং" বলিয়া সাধন আরম্ভ করিলেন! অনেকক্ষণ সাধনের পর তাঁহার মনে হইল, সত্যং নাম সাধন করিতেছি, কিন্তু সত্য কি? মনের মধ্যে যেমন এই চিন্তার উদয় হইয়াছে অমনই স্বর্গের রাজা বিবেক তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বস্থ লতাগুচ্ছের ভিতর হইতে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, "জান না? ঈশ্বর সত্য।" তাঁহার কথা শেষ হইবামাত্রই বামপার্শ্বস্থ লতামণ্ডপ হইতে দেবশিশু বৈরাগ্য বাহির হইয়া বলিলেন, "শুদ্ধ ঈশ্বর নহে, পরকালও সত্য।" বৈরাগ্যের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই পশ্চাদ্ভাগের পুষ্পস্তবক হইতে দেবকন্যা হরিপ্রেম কুসুমভূষণে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, "আরও একটী আছে, বৎস প্রবোধ। আত্মায় তুমিও সত্য।" প্রবোধের সম্মুখে

যেন এক আশ্চর্য্য নাটকের অভিনয় হইল। তিনি বিস্ময়ে দেবতাত্রয়ের চরণে নমস্কার পূর্ব্বক করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে?" বিবেক বলিলেন, "আমি স্বর্গের রাজা বিবেক।" বৈরাগ্য বলিলেন, "আমি স্বর্গের পথপ্রদর্শক বৈরাগ্য।" হরিপ্রেম বলিলেন, "আমি স্বর্গ এবং পৃথিবীর জননী হরিপ্রেম।' প্রবোধচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা স্বর্গের দেবদেবী হইয়া এ মর্ত্ত্যলোকে এ অধমের কুটীরে আসিলেন কেন?" হরিপ্রেম উত্তর দিলেন, "নবযুগে প্রেমাবতার শ্রীহরি পাপী তাপী ও ভক্তগণের কল্যাণের জন্য এক নূতন নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে নরনারী দলে দলে সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে নদীর তটে তটে পর্ব্বতের গহ্বরে গহ্বরে কত কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবানকে অন্বেষণ করিত, কিন্তু এ যুগে ভগবান নিজে তাঁহার পুত্রকন্যার দ্বারে দ্বারে গিয়া প্রেমভক্তি ভিক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্বে মানবে দেবতাকে খুঁজিত, এখন দেবতা মানবকে খুঁজিতেছেন। সেইজন্যই আমরা আজ তোমায় খুঁজিতে খুঁজিতে তোমার লতামণ্ডপের দ্বারে অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা তোমার সঙ্গে নিয়ত বাস করিতে চাই।"

প্রবোধের চক্ষে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িল। বিবেক বলিলেন, "প্রবোধ! যদি আমার একটী কথাও অগ্রাহ্য না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইব।" বৈরাগ্য বলিলেন, "শুদ্ধ বিবেকের কথা শুনিলেই চলিবে না, আমার কথাও শুনিতে হইবে।" প্রবোধচন্দ্র করি-

যোড়ে বলিলেন, "দয়াময় যদি আমাকে দয়া করেন, তাহা হইলে আপনাদের সকল কথাই শুনিতে পারিব।" হরিপ্রেম বলিলেন, "বৎস! বিবেক ও বৈরাগ্য যেখানে সন্তুষ্ট থাকেন, আমিও সেখানে চিরকালের মত আবদ্ধ থাকি। তাহা ছাড়া সমুদায় জগতেই আমার স্নেহ-ক্রোড় প্রসারিত; পাপী সাধু, কাঙ্গাল রাজা, আমি কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি না। তোমার কোন ভয় নাই, অদ্য সাধনের প্রথম দিনে আমরা স্বর্গ হইতে আসিয়া তোমার সহায় হইলাম। নির্ভয়ে গুরুর উপদেশে সাধনে প্রবৃত্ত থাক, আবশ্যক বুঝিলেই আমরা তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হইব।" এই বলিয়াই সকলে অন্তর্হিত হইলেন। প্রবোধ অজ্ঞানভাবে সাধন-বেদীর উপরে বহুক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। অপরাহ্নে শান্তিপ্রিয় আসিয়া নিকুঞ্জ দ্বারে ডাকিল, "দাদা প্রবোধচন্দ্র! অদ্যকার সাধন শেষ হইয়াছে, মহর্ষি আশ্রমে যাইয়া নামসঙ্কীর্ত্তন এবং আহার ও বিশ্রাম করিতে আদেশ করিয়াছেন।" প্রবোধচন্দ্র উঠিয়া শান্তিপ্রিয়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে আশ্রমে চলিয়া গেলেন। রজনীযোগে মহর্ষিকে বিবেক, বৈরাগ্য ও হরিপ্রেমের কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি শীঘ্রই সিদ্ধিলাভের বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিলেন।

দ্বিতীয় দিবস।

প্রভাত হইতে না হইতেই নিকুঞ্জে প্রবোধের বীণা বাজিল। শিশিরসিক্ত লতিকাপ্রসূনে আনন্দময় মধুকরের গুন্ গুন্ ধ্বনি বীণাধ্বনিতে মিশিয়া আনন্দময় হরিধনের

জয়ধ্বনি আরম্ভ করিল। অদূরে আশ্রমস্থ ঋষিবালিকগণের মিলিতস্বরে "তং পরং পরমেশ্বরং অমৃতানন্দ রূপং" গান অল্প অল্প শ্রুত হইতে লাগিল। যোগানন্দ অনুচ্চস্বরে "পরিপূর্ণমানন্দং অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানং" গাহিতে গাহিতে তথায় আগমন করিলেন। প্রবোধচন্দ্র চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আমার সাধনের বস্তু কি?" আচার্য্য বলিলেন, "জ্ঞানং। ঈশ্বর সত্য, একথা বুঝিয়াছ, এখন তিনি যে জ্ঞানময়, ইহাই সাধন করিতে হইবে। জলে, স্থলে, আকাশে, অনিলে, তাঁহার উজ্জ্বল জ্ঞান চিরপ্রকাশিত, ইহাই দেখিতে হইবে। তুমি সাধন আরম্ভ কর, আমি চলিলাম।" ইহা বলিয়া যোগানন্দ চলিয়া গেলেন এবং প্রবোধচন্দ্র ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। একতারা বাজাইয়া জ্ঞানময় চৈতন্যময় ব্রহ্মনাম গাহিতে লাগিলেন। ক্রমে যতই দিবাভাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সাধন ততই গাঢ়তর হইতে লাগিল। হঠাৎ প্রবোধের মনে হইল, জ্ঞানময় ঈশ্বর কি এই লতাকুঞ্জের ভিতর আছেন? আমার দেহমন্দিরের ভিতরে আছেন? যদি থাকেন তবে দেখিতে পাইতেছি না কেন? যেমন তাঁহার মনে এই সংশয়ের উদয় হইল, অমনই তৎক্ষণাৎ বিবেক আবির্ভূত হইয়া তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, "কি প্রবোধ! জ্ঞানস্বরূপের সত্তাতে সন্দেহ? যদি তিনি এখানে নাই তবে আমরা কোথা হইতে আসিলাম? তোমার দেহের ভিতর যদি ব্রহ্মশক্তি নাই তবে তুমি জীবিত আছ কিরূপে?

প্রবোধচন্দ্র একটু লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি আমাকে দর্শন করিতেছেন?" বিবেক বলিলেন, "কি আঁধারে কি আলোকে সেই জ্ঞানময় দেবতা তোমাকে সর্ব্বদাই দেখিতেছেন। তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টি অতিসূক্ষ্ম কীটাণুকীট হইতে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশিখর পর্য্যন্ত সমস্তই দেখিতেছে। তুমি অনুবীক্ষণ যন্ত্রসহায়ে একটি কীটাণুকে তন্ন তন্ন করিয়া দর্শন কর, তাহার ভিতরেও সেই অনন্ত জ্ঞানকৌশল দেখিয়া অবাক্ হইবে, আবার দূরবীক্ষণসংযোগে বিশাল সৌরজগতের যে কোন একটী জ্যোতিষ্ককে পরিদর্শন কর, তাহার ভিতরেও সেই মহান্ পুরুষের জ্ঞান পরিপূর্ণ হস্ত সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়রসে আপ্লুত হইবে। প্রবোধ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বালকের ক্রীড়া নহে! ইহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বিন্দুতে বিন্দুতে এক ভূমা পুরুষের জ্ঞানজ্যোতিঃ অনন্ত দিকে বিকীর্ণ হইতেছে! এককণা হিমাণী, এক বিন্দু ধূলি, সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যমান! সেই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ গাহিয়াছিলেন, "যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপসু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।" অর্থাৎ যে দেবতা অগ্নিতে যিনি জলেতে যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।"

প্রবোধচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্ঞানময় ব্রহ্ম কি প্রতিনিয়তই ক্রিয়াশীল?" বিবেক উত্তর দিলেন, "বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং

অদ্যাবধি চিরকাল প্রতিক্ষণেই সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। যদি কোথাও একটুকু বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা তিনিই প্রবাহিত করিতেছেন; যদি কোথাও একটী জীব জন্মগ্রহণ করে, তাহা তাঁহারই কার্য্য; যদি কোথাও একটী প্রাণী বিনষ্ট হয়, তাহা তাঁহারই ইচ্ছা। মূল কথা, তিনিই সমস্ত বিশ্বের চৈতন্যশক্তি, তাঁহা ভিন্ন কিছুই থাকে না। তোমার প্রাণের মধ্যে তিনিই নড়িতেছেন, এবং সমুদায় জগতের মধ্যে তিনিই সহস্র হস্তে সহস্র পদে সহস্র ভাবে কার্য্য করিতেছেন। সেই জন্যই ঋষিবংশ তাঁহাকে "সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"

প্রবোধ বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যিনি অসীম আকাশে পরিব্যাপ্ত, চন্দ্রসূর্য্য যাঁহার প্রভায় প্রভান্বিত, জলে স্থলে পর্ব্বত-চূড়ায় যিনি চিরবিস্তৃত, সহস্র হস্তে সহস্র পদে যিনি প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল, এত বড় প্রকাণ্ড ব্রহ্মবস্তুকে আমি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কিরূপে ধারণা করিব?" বিবেক বলিলেন, "প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-গৃহে যাঁহার স্থান সংকুলান হইল না, তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়-গৃহে তাঁহাকে কিরূপে স্থান দিবে? অথর্ব্ববেদে লিখিত আছে, "তাঁহার সত্তার ভিতরে সমুদায় লোক, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড, সলিল ও বেদ, সৎ ও অসৎ, তপস্যানন্তর ব্রত, ব্রতানন্তর অনুষ্ঠান, শ্রদ্ধা, ভূমি, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু স্থিতি করিতেছে।" তোমার মত কোটী কোটী প্রবোধ সেই অনন্ত দেবের গর্ভের ভিতরে কোথায় লুকাইত হইয়া রহিয়াছে! ক্ষুদ্র শফরী যেমন অগাধ মহাসমুদ্রগর্ভে

চিরনিমগ্ন হইয়া সন্তরণ করিতেছে, তুমিও তেমনই সেই অগম্য অপার জ্ঞানজলধিতে নিরন্তর নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছ। এক্ষণে যোগপক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক সন্তরণ দিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইবে। অনন্ত ঈশ্বরকে পরিমাণ করিতে যাইও না, কিন্তু সমাধিভরে যোগচক্ষু মেলিয়া জলে স্থলে গগণতলে তাঁহার চির উজ্জ্বল প্রকাশ দর্শন করিয়া আপনার ক্ষুদ্র জীবত্ব ভুলিয়া যাও। চারিদিকে সেই অনন্ত জ্ঞানময়কে দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অনন্ত চরণে নমস্কার কর।" বিবেকের মুখে ব্রহ্মতত্ত্বকথা শুনিতে শুনিতে প্রবোধের প্রাণ সমাধিতে ডুবিয়া গেল। তিনি সম্মুখে অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত পাদপদ্ম দর্শন করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম পূর্ব্বক অনন্ত হরিরূপ সিন্ধুতে সুখে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। বিবেক সময় বুঝিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সন্ধ্যা-সময়ে যোগানন্দ আসিয়া শুনিলেন, প্রবোধের বীণা "অনন্তং অনন্তং" রবে বাজিতেছে। তিনি বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! প্রাতে জ্ঞানস্বরূপের সাধনা আরম্ভ হইল, অনন্ত দেবতা নিজে সন্ধ্যাকালে তাঁহার দীন সাধককে অনন্তস্বরূপে লইয়া গেলেন! প্রভো! তুমি নিজেই সকল কর, আমরা কেবল উপলক্ষ মাত্র।" পরে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত প্রবোধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! সমস্ত দিবসের সাধনায় বড়ই ক্লান্ত হইলে, বিশ্বজননীর অনন্ত ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছ, আমি আর তোমার চৈতন্য সম্পাদন করিব না। এস তোমার সমাধিমগ্ন অবশ দেহকে আমি স্কন্ধে করিয়া আশ্রমে লইয়া যাই।" এই বলিয়া

বৃদ্ধ গুরুদেব যুবক শিষ্যের দেহ স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। স্বর্গ হইতে দেবতারা হরিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় দিবস।

প্রাতসূর্য্যের নবপ্রকাশিত কিরণচ্ছটায় সাধন-কুটীরাভ্যন্তরে প্রবোধের ধূল্যবলুন্ঠিত কলেবর দৃষ্টিগোচর হইল। ধনীর সন্তান দীন হীন কাঙ্গালের বেশে সামান্য গৈরিক বসনে লজ্জামাত্র নিবারণ করিয়া শুষ্ক মুখে মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আছেন। ব্রহ্মচর্য্য সাধনের বিগত দুই দিবসের অপর্য্যাপ্ত আহারে দেহ ক্ষীণভাব ধারণ করিয়াছে। হস্তের একতন্ত্রী দূরে ফেলিয়া নিরাশ মনে সম্মুখস্থ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব! সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে মহান্ ঈশ্বর ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছেন, অনন্ত আকাশের অনন্ত বিশাল গ্রহ উপগ্রহ সকল যাঁহার নিয়মে প্রতিক্ষণ পরিচালিত হইতেছে, সেই ভূমা দেবতা সেই অনন্ত লোকনাথ বিশ্বেশ্বর আমার মত একজন ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র মহাপাপীকে দয়া করেন, ইহা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?" যোগানন্দ উত্তর দিলেন, "বৎস! হস্তের একতন্ত্রী হস্তে লইয়া "দয়াময়" নাম সাধন কর, তাহা হইলেই দয়াময় শ্রীহরি তোমার অন্তরে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া সমুদায় বুঝাইয়া দিবেন। তোমার মত দীন সাধককে তিনি কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।" এই বলিয়া তিনি আশ্রমে গেলেন এবং প্রবোধচন্দ্র শুষ্ক-

বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক একতন্ত্রী-সংযোগে "দয়াময়" নাম গান করিতে আরম্ভ করিলেন। কাঙ্গাল সাধকের ব্যাকুল চীৎকারে স্বর্গে কাঙ্গালশরণের সিংহাসনকে কম্পিত করিল। যিনি ধ্রুবের ক্রন্দন শুনিয়াছিলেন, যিনি প্রহ্লাদের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার সমুদায় যন্ত্রণা নিবারণ করিয়াছিলেন এবং যিনি সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক নরনারীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহাদের মনোবেদনা দূর করিয়া আসিতেছেন, আজ তিনি প্রবোধের ক্রন্দন কিরূপে উপেক্ষা করিবেন? প্রবোধ ভাবাবেশে নাম গাহিতে গাহিতে বলিলেন, "অখণ্ড বিশ্বেশ্বর! তুমি কি আমাকে সত্য সত্যই দয়া কর? তোমার এত ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া আমার প্রাণ নিতান্তই নিরাশ-সাগরে ডুবিয়াছে। এত বড় দেবতা তুমি, আর এত সামান্য কীট আমি, আমার উপরে তোমার অজস্র করুণা কি সম্ভব হইতে পারে?" প্রবোধের কথা শেষ হইতে না হইতেই হরিপ্রেম তথায় অবতীর্ণা হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! প্রবোধ! এখনও করুণাময়ের করুণার উপরে তোমার এত সন্দেহ? মনে করিয়া দেখ, যে দিনে তোমার কপট বন্ধু রামদাস ও শ্যামদাস তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া বিজন অরণ্যের মধ্যে তোমাকে মৃতবৎ ফেলিয়া দিয়াছিল, সে দিনে এই রাজরাজেশ্বরী মা জগজ্জননী কি প্রেমক্রোড় বিস্তার করিয়া তোমাকে রক্ষা করেন নাই? আবার যে দিনে আনন্দ-আশ্রমের সন্নিহিত জাহ্নবী-তীরে নিজ পূর্ব্বকৃত পাপরাশি স্মরণ করিয়া জীবন্ত

নরকের শত সহস্র রৌরবাগ্নিতে একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিলে, সে দিনে এই অনন্ত করুণাময় শ্রীহরি কি তোমার সেই চিতাভস্ম নিজ পুণ্যময় প্রেমহস্তে স্পর্শ করিয়া স্বর্ণময় নবজীবন দান করেন নাই? এতদ্ভিন্ন ঘোর অন্ধকারময় জননী-জঠরে তোমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক আহার ও বাতাস দান করিয়া তোমাকে কি সজীব রাখেন নাই? না জন্মান্তে মাতৃস্তনযুগলের লোহিতবর্ণ রক্তধারাকে শুভ্র দুগ্ধধারাতে পরিণত করিয়া তোমার কোমল কণ্ঠে অকাতরে ঢালিয়া দেন নাই? আর তুমি যে এত বৎসর পৃথিবীতে সুখে জীবিত রহিয়াছ, ইহা কি সেই জন্মদাতা করুণাসাগর পিতার করুণা নহে?”

হরিপ্রেমের তিরস্কার বাক্যে প্রবোধচন্দ্র বিশেষ লজ্জিত হইলেন এবং ব্রহ্মের ‘দয়াময়’ নামে সন্দেহ করিয়া তিনি যে বিষম অপরাধ করিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারিলেন। তখন হরিপ্রেমের চরণ জড়াইয়া বলিলেন, “মা! আপনি আবার আসিয়াছেন? আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। অনন্ত করুণাময়ের জীবন্ত করুণায় আমি আর সন্দেহ করিব না। যে অক্ষর পুরুষের শাসনে দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, সেই মহতো মহীয়ান্ পূর্ণ দেবতা যে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র তিহীন জীবনের জন্যও এত দয়া করেন, ইহা বড়ই চমৎকার ব্যাপার!”

হরিপ্রেম। কেন? তুমি ত নিজ মুখেই দয়াময়ী বিশ্বমাতার কত দয়ার কথা বলিয়াছ!

প্রবোধ। তখন স্বোপার্জিতসংস্কারবশতঃ তাঁহাকে ক্ষুদ্র

পুত্তলিকার মত পরিমিত একজন সামান্য দেবতা ভাবিতাম। এখন দেখি তাঁহার মত প্রকাণ্ড ঈশ্বর কেহ কখনও কল্পনাতেও ভাবিতে পারে না। তাঁহার শাসনে সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবী আদি গ্রহ উপগ্রহ সকল স্ব স্ব কক্ষে পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার রাজ্যের কোথাও সীমা নাই। তিনি অনাদি অনন্ত!

হরিপ্রেম। তিনি অনাদি অনন্ত বলিয়াই তাঁহার এত প্রেম! মনুষ্যের ন্যায় যদি তিনি ক্ষুদ্র হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রেম ও করুণাও মানবের প্রেম ও করুণার মত ক্ষুদ্রই হইত। তিনি মহান্, সেইজন্য তাঁহার প্রেমও মহীয়সী। সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার রাজ্য, সেইজন্য সে সকলেরই উপরে তাঁহার অনন্ত ভালবাসা। সামান্য একটী কীট হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীবজন্তু সকলেরই উপরে তাঁহার করুণা সমভাবে বিরাজিত। শাস্ত্রে কথিত আছে, তিনি পিপীলিকার পদশব্দও শ্রবণ করেন। অতএব নিরাশ হইও না। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দয়াময়ের দয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া প্রবোধ লাভ কর। তোমার নিজ জীবনে যতদিন না সেই জীবনদাতার জীবন্ত প্রেমপ্রতিমা সন্দর্শন করিবে, ততদিন তোমার সাধন দৃঢ় হইবে না। সযতনে সদ্গুরুর উপদেশে অনুরাগের সহিত সাধন কর, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে।

এই বলিয়া হরিপ্রেম অন্তর্হিতা হইলেন। প্রবোধচন্দ্র বীণা লইয়া বাজাইতে বাজাইতে গাহিলেন, "দয়াময় হরি দয়াময় হরি জপরে মন রসনা।" গাহিতে গাহিতে সর্ব্বস্থলে

সেই নিরাকারা জননীর স্নেহ ও প্রেম প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রেমরসে মন মজিয়া গেল। বাঁশীঝঙ্কার শতগুণ সুমধুর হইল। শ্রীহরির ভুবনভরা রূপসিন্ধুতে ডুবিয়া গিয়া প্রবোধচন্দ্র বলিলেন, "আহা শ্রীহরি! তুমি কি সুন্দর! যেদিকে তাকাই সেইদিকেই তোমার অতুল রূপে ভুবন আলোকিত হইয়াছে। কে বলে তোমাকে দেখা যায় না? আমি যে আজ তোমাকে জলে স্থলে অনলে অনিলে ও আকাশপটে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম! আহা! পূর্ব্বে তোমাকে ডাকিয়া তোমার আবির্ভাবে আনন্দে বিভোর হইয়াছিলাম, তখন ত এমন বিশ্ববিমোহিনী সৌন্দর্য্যচ্ছটা দেখিতে পাই নাই! কিন্তু আজ তোমার দীন হীন কাঙ্গালকে যে অপরূপ রূপ-মাধুরী দেখাইলে, ইহার কথা ত কোনও শাস্ত্রে শুনি নাই! এক চন্দ্রে জগৎ উজ্জ্বল, কিন্তু এ যে কোটী চন্দ্রের একত্র সমাবেশ! আর কি আমার দুঃখ শোক থাকে? ঠাকুর! জীবন্ত ঠাকুর! আজ যথার্থই প্রাণের সকল জ্বালার শান্তি হইল। এতদিনে তোমার নামের মহিমা বুঝিলাম। নামের ভিতরেই যে স্বয়ং তুমি, ইহা ত পূর্ব্বে জানিতাম না। তোমার নামমাত্র জপ করিয়া আজ তোমার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিলাম। আহা! কি বলিয়া তোমার এ রূপের উপমা দিব? নীরদবরণ বলিব? ছি! নীরদমালা তোমা-রই রূপসিন্ধুর কণিকামাত্র পাইয়া অত সুন্দর, তবে তাহা কিরূপে তোমার বর্ণ হইবে? ধ্রুব তোমাকে পদ্মপলাশ-লোচন বলিয়াছিলেন। ধ্রুব পঞ্চমবর্ষীয় শিশু। তোমার

মহিমা কিছুই জানিতেন না, সুতরাং ও কথা বলিয়া তাঁহার প্রাণে তৃপ্তি হইয়াছিল ; কিন্তু আমি কি তোমাকে ও নামে ডাকিতে পারি ? তোমার রূপ ত পার্থিব কোন রূপ নহে, সুতরাং পার্থিব কোন ভাষাও ইহা ব্যক্ত করিতে পারে না। তোমার রূপ অপার্থিব স্বর্গীয় সুষমা। হরি হে! তোমার মাধুরী, বর্ণনার বিষয় নহে, কিন্তু প্রাণভরিয়া দর্শন ও সম্ভোগের জিনিস।" বলিতে বলিতে প্রবোধ হরিরূপসাগরে একেবারে ডুবিয়া গেলেন। দিবাবসান সময়ে বালক প্রেমচন্দ্র আসিয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গ পূর্ব্বক আশ্রমে লইয়া গেলেন।

চতুর্থ দিবস।

আজ ব্যাঘ্রাজিনধারী বিভূতিবিভূষণ বৈরাগ্য জটাজাল বিলম্বিত করিয়া প্রবোধের সাধনকুটীরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "প্রবোধ! করুণাময় ভুবনরঞ্জন শ্রীহরিকে মঙ্গলময় বলিয়া জানিও। লোকে একটুমাত্র সাংসারিক কষ্ট পাইয়াই তাঁহার শুভ ইচ্ছার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া থাকে, সর্ব্বকল্যাণের আধার ভগবানের সুন্দর চরিত্রে কলঙ্ক-কালি অর্পণ করেন কিন্তু বিশ্বাস করিও যে, রোগে শোকে দুঃখে বিপদে তিনি প্রতিনিয়তই জীবের মঙ্গল সাধন করিতেছেন।" প্রবোধচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবকে কষ্ট দিয়া মঙ্গল বিধান করেন, ইহা কিরূপ মঙ্গল ?" বৈরাগ্য বলিলেন," এ সংসারের অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া নর-নারী নিত্য সনাতন বস্তু হইতে আপনাপনি বঞ্চিত

হইতেছে। সেইজন্যই পরম কারুণিক প্রেমময় দেবতা যাহাতে তাঁহাদের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতেছেন। শরীর যে অসার, রোগ দিয়া তাহাই দেখাইতেছেন এবং আত্মীয় স্বজন লইয়া সংসার-ক্রীড়ায় মত্ত থাকাও যে দুদিনের জন্য, শোক দিয়া তাহাই বুঝাইয়া দিতেছেন। রোগে ও শোকে মহাবলবান বীরের বীরত্ব চূর্ণ এবং ঘোর সংসারীর সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে পরম শান্তিধারার জন্য তৃষিত করে। এরূপ দেখা গিয়াছে, রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মহাপাপী সকল পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবানিশি পবিত্রভাবে হরিনাম জপ করিতেছে, অথবা সর্ব্বত্যাগী হইয়া কোন দেব-মন্দিরের দ্বারে পড়িয়া আছে। এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে, শোকে কাতর হইয়া রাজা ও রাণী রাজসুখকে তুচ্ছ করিয়া দীন হীন কাঙ্গালবেশে ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া কাঁদিতেছে। বৎস! সর্ব্বমঙ্গলময়ের চিরমঙ্গলময় বিধানে ভ্রমে সন্দেহ করিও না।"

প্রবোধচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা দেব! একজন কাঙ্গালিনী বিধবার একটীমাত্র উপযুক্ত পুত্র আছে, তাহারই উপার্জ্জনে অতিকষ্টে হতভাগিনীর দিনপাত হয়, বিধাতা যখন নির্দ্দয় হইয়া সেই অন্ধের নয়নটীকে অকালে উৎপাটন করেন, তখন তাঁহাকে কি বলিতে ইচ্ছা হয়?" বৈরাগ্য উত্তর দিলেন, "সাংসারিক মানব সাংসারিক ক্ষতিকেই প্রমাদ বলিয়া গণনা করে, কিন্তু স্বর্গরাজ ঈশ্বর যাহাতে মানবের স্বর্গপ্রাপ্তির ব্যাঘাত হয় তাহাকেই

প্রমাদ বলেন; সুতরাং বিধবার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে সাংসারিক লোকে বিষম অমঙ্গল বলিয়া গণ্য করে এবং স্বর্গাধিপতি শ্রীহরি পরম মঙ্গল বলিয়া বাঝেন। যেজন এই অনিত্য সংসারকেই সর্ব্বস্ব এবং তুচ্ছ অন্নবস্ত্রলাভকেই পরম সুখ বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহার সেই সংসার-সর্ব্বস্ব এবং পরম সুখকে বিনষ্ট করিয়া পরকালের অনন্ত সুখ ও শান্তিকে দেখাইয়া দেওয়া কি মঙ্গলের কার্য্য নহে? প্রবোধ-চন্দ্র। তোমরাই মৃত্যুকে 'সর্ব্বনাশ' বলিয়া থাক, কিন্তু আমরা উহাকে মা মঙ্গলময়ীর 'আশীর্ব্বাদ' বলিয়া বুঝি।"

প্রবোধচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অতিবৃষ্টি, অনা-বৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ মহামারী, জলপ্লাবন এবং প্রবল ঝটিকা প্রভৃতি জীবের পীড়াদায়ক নৈসর্গিক ব্যাপার সমদায়কেও কি মঙ্গল বলিয়া বুঝিব?" বৈরাগ্য সতেজে বলিলেন, "অবশ্য! এ সমুদায় ব্যাপারের মধ্যে তোমরা মহা অনর্থ দর্শন কর, কিন্তু আমরা সেই প্রেমময়ের প্রেম ভিন্ন আর কিছুই দেখি-না। অতিবৃষ্টিতে পৃথিবী সরস এবং অনাবৃষ্টিতে উত্তপ্ত হয়। দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে মানবের ঈশ্বরভয় বৃদ্ধি করে, সুতরাং বৃথা দর্প, অহঙ্কার, হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতি পাপাচার, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতি অনাচার এবং ভয়ানক উৎ-পাতের দমন ও দেশের নিদ্রিত বিবেক জাগরিত হয়। এবং জলপ্লাবন ও ঝটিকাদিতে দেশের ভূমি উর্ব্বরা করে, তরুলতাকে ফলপুষ্পে ভূষিত করে, বিষাক্ত বায়ু শুদ্ধ করে এবং এক দেশের উদ্ভিজ্জ ও জীবকে অন্য দেশে বহন করে। বৎস! ভুবনেশ্বর ভুবন রক্ষার জন্য যে সকল ব্যাপার

করিতেছেন, তাহার এক কণিকাও মন্দ ফল প্রসব করে না। কেবল তুমি বুঝনা তাই তাঁহাকে অমঙ্গলময় বল। সূর্য্যের উত্তাপ ও চন্দ্রের শৈত্য, বজ্রের ভীষণ শব্দ ও হিমানীর শীতল সংস্পর্শ, বিষের জ্বালা ও অমৃতের মিষ্টতা, রোগের যন্ত্রণা ও সুস্থতার সুখ, মৃত্যুর হাহাকার এবং জন্মের আনন্দ-কোলাহল, এ সমুদায়েরই ভিতরে শুভদাতা বিধাতা মুক্ত-হস্তে কেবলই কল্যাণ বিতরণ করিতেছেন।"

প্রবোধ কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে আমার দিব্যদৃষ্টি বিকসিত হইল। কিন্তু যখন এইরূপ কোন ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব প্রত্যক্ষ না দেখিতে পাইব, তখন প্রাণ যে স্বভাবতঃই অস্থির হইবে, তাহার উপায় কি?" বৈরাগ্য গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বৎস! তোমাদের জ্ঞান অতি অল্প: সেই অল্প জ্ঞানে মহাজ্ঞানময় দেবতার কার্য্যের সমুদায় অংশই যে বুঝিতে পারিবে, এমত আশা করিও না। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝিয়া রাখ যে, করুণাময় পরমপিতা যাহা করেন, তাহাই মঙ্গল। যদি তাঁহার উপরে তোমার ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় কার্য্যই তোমার নিকটে সুমধুর বলিয়া উপলব্ধি হইবে। যে সকল ব্যক্তি পরমেশ্বরকে আন্তরিক ভালবাসেন, তাঁহারা তাঁহার কার্য্যে কোনই ত্রুটি দেখিতে পান না। শাস্ত্র যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে ভালবাসে না, তাহারাই তাঁহার উপরে কত শত প্রকারে দোষারোপ করিয়া থাকে। তাহারা চাহে যে, তাহাদের পাপকার্য্যেও ভগবান কোন বাধা না দেন। মনুষ্যপাপীর

মদ্যপানে কি ব্যভিচারীর ব্যভিচারদোষে পীড়া হইয়া থাকে, তাহাতেও ঈশ্বরের উপরে তাহারা বিরক্ত হয়। যে পরের মন্দ করিতে গিয়া বিপদে পড়ে, সেও ঈশ্বরকে গালাগালি দেয়। ন্যায়বান বিধাতার অপরাধ কি বল? যে মন্দ কার্য্য করে, তিনি তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন এবং যে ভাল কাজ করে, তিনি তাহাকে পুরস্কার দেন। পাপী পাপের দণ্ড পাইলে যদি বলে তাহার প্রতি অমঙ্গল বিধান করা হইল, তাহা হইলে তাহার আর প্রতিবিধান কি আছে? নাস্তিকতা, বিলাস এবং পাপের ভীষণ প্রবাহে সভ্য অসভ্য স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রবলবেগে ভাসিয়া যাইতেছে, সুতরাং কল্যাণদাতা বিধাতার ন্যায়, প্রেম ও মঙ্গলভাব দর্শন করিবার শক্তি কাহারও নাই। পৃথিবী জানেনা বটে, কিন্তু স্বর্গ জানেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময়।" এই কথা বলিয়াই বৈরাগ্য অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

প্রবোধ পূর্ব্বদিনে যেমন সমুদায় জগতে শ্রীহরির অতুল রূপরাশি দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন, অদ্যও সেইরূপে সমুদায় ঘটনায় তাঁহার মঙ্গলভাব দেখিয়া আরও মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। যিনি ভুবনমোহন হরি, তিনিই আবার সর্ব্বমঙ্গলা জননী, ইহা ভাবিয়া তিনি শতগুণ অধিক ভক্তিরসে গলিয়া গেলেন। "তুমি মঙ্গলময়" "তুমি মঙ্গলময়" সুরসংযোগে এই নাম জপিতে লাগিলেন। জপিতে জপিতে সর্ব্বমঙ্গলময় দেবতাকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াই ভক্তিভরে ক্রমাগত নমস্কার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম দিবস।

প্রভাতে প্রবোধচন্দ্র গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব! লোকে বলে, ভগবান বাঞ্ছাকল্পতরু, যে যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করেন। ইহা কি সত্য?" যোগানন্দ উত্তর দিলেন, "অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি বাস্তবিকই ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।"

প্রবোধ। তবে পৃথিবীতে লোকের এত কামনা অপূর্ণ থাকে কেন? কত দরিদ্র শত প্রার্থনা করিয়াও ধনধান্য লাভ করিতে পারে না, কত রোগী মৃত্যুঞ্জয়ের চরণে দিবানিশি কাঁদিয়াও আরোগ্য লাভ করে না, জননী বুকের রক্তে দেবপদ ধৌত করিলেও সন্তানকে অকালে প্রাণত্যাগ হইতে রক্ষা করা যায় না এবং সতীর নয়ন কমল তুলিয়া বিশ্বেশ্বরীর শ্রীচরণে অর্পণ করিলেও তাঁহার প্রাণপতি জীবিত থাকেন না। এ সকল দেখিয়া কে তাঁহাকে বাঞ্ছা-কল্পতরু বলিবে?

যোগানন্দ। বৎস! এ সকল ব্যাপারে পৃথিবীর লোকে বড়ই ভ্রমে পতিত হয়। প্রার্থনা করিতে হইবে বলিয়াই তুমি যদি যাহা তাহার জন্য প্রার্থনা কর, তাহা হইলে সে প্রার্থনা কখনই পূর্ণ হইবে না। শিশু যদি আকাশের চাঁদ ধরিবার জন্য প্রার্থনা করে, ভগবান কি তাহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন? তেমনই বিশ্বস্রষ্টার প্রাকৃতিক নিয়মে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করা মূর্খের কার্য্য। একজন চিরজীবন আলস্যে

দিনপাত করিয়া শেষে অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইয়া প্রার্থনা করিতেছে, তাহার আলস্যজনিত মহাপাপের ফলভোগ না হইতেই কি সে ধন ধান্য লাভ করিবে? দীনবন্ধু দয়া করেন বলিয়া ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। মঙ্গলময় নিজ পূর্ণ জ্ঞানের সহিত সকল দেখিয়া ও বুঝিয়াও মঙ্গল উদ্দেশ্যে জননীর সন্তান কি সতীর পতিকে কাড়িয়া লইতেছেন, তুমি প্রার্থনা করিলে বলিয়াই কি তিনি সে কার্য্য হইতে বিরত হইবেন? তিনি নিজে যাহা করেন তাহার বিরুদ্ধে তোমার কোটী প্রার্থনাও ভাসিয়া যাইবে। সেইজন্য সাধকমাত্রেই পার্থিব ধন জন মান কিছুই প্রার্থনা করেন না, কিন্তু আত্মার কল্যাণের জন্য জ্ঞান বৈরাগ্য প্রেম ও ভক্তি প্রভৃতিই যাচ্ঞা করেন। কেন না, মানবাত্মার উদ্ধার সাধনে পরিত্রাতা ঈশ্বর সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তোমার আত্মার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা কর, দেখিবে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা প্রদান করিবেন। মহাপাপ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য তাঁহার নিকটে কাঁদ, তিনি অমনই তোমার চক্ষের জল মুছাইয়া তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। রোগে শোকে আকুল হইয়া হরিনাম কর, দেখিবে তোমার সকল জ্বালা দূরে গিয়া প্রাণে বিমল শান্তিরসের সঞ্চার হইবে।

প্রবোধ। যদি সাংসারিক কোন বস্তু তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলেও পাওয়া না যায়, তবে তিনি কল্পতরু কিরূপে হইলেন?

যোগানন্দ।—কেন হইবেন না? সাংসারিক কোন

বস্তুরই জন্য প্রার্থনার আবশ্যকতা নাই। পৃথিবীকে তিনি এমনই ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যথাসময়ে একটুমাত্র শ্রমেই তোমার আবশ্যকীয় সমুদায় বস্তু তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। বৃক্ষে আপনিই অগণ্য ফল ধরিয়া থাকে। মেঘ আপনিই বারি-বর্ষণ করে। সামান্য যত্ন করিলেই বনের ফল ও নদীর জল তুমি অপর্য্যাপ্ত রূপে পাইতে পার। এবং একটু পরিশ্রম করিয়া ভূমিকর্ষণ ও বীজরোপণ করিলেই অপরিমিত শস্য পাওয়া যায়। কিন্তু তুমি যদি জ্ঞান ও শক্তি পাইয়াও তাহার পরিচালনা না কর, তাহা হইলে তোমাকে অবশ্যই দারিদ্র্য-যন্ত্রণা সম্ভোগ করিতে হইবে। আবার বিলাসে মানুষকে অধিক দরিদ্র করে। পূর্ব্বকালের ঋষিবংশ বনের ফলমূল খাইয়া বৃক্ষের বল্কল পরিয়া কুটীরে বাস করিতেন, তাঁহাদের কোনই দুঃখ ছিল না; কিন্তু আজ-কালকার সভ্যবংশ নানাবিধ চোষ্যচূষ্যলেহ্যপেয় সামগ্রী আহার করিয়া সোণায় মোড়া বস্ত্র পরিয়া এবং রাজার ন্যায় অট্টালিকায় বাস করিয়াও চিরদুঃখী। জহরতের সিংহাসনে বসিয়া কহিণুরের মুকুট পরিয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যদি সমস্ত পৃথিবীকে তাঁহার পদতলে আনিবার জন্য প্রার্থনা করেন, ভগবানকে কি সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে? অন্নদায়িনী জননী তোমার পেটের দুটো ভাত দিবার জন্য দায়ী, তোমার সৃষ্টিছাড়া আবদার শুনিবার জন্য দায়ী নহেন। তবে যাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্য করিবার জন্য আসেন, প্রাণ দিয়া জীবের সেবার জন্য

পরিশ্রম করেন, মুক্তি ও ভক্তি ধন বিলাইবার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন, সেই সব ভক্তের আবদার তাঁহাকে শুনিতে হয়। ভক্ত যখন ভক্তসংসারেরই কার্য্যের জন্য পথের ভিখারী হয়েন, তখন তিনি ভক্তের মুখে অন্ন না দিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। সেই-জন্যই ঈশা বলিয়াছিলেন, "কি আহার করিব, কি পান করিব, ইহা বলিয়া আপনার জীবনের জন্য ভাবিত হইও না।" ভক্ত অন্নবস্ত্রের জন্য ভাবেন না। সেইজন্যই ভাগবত বলিয়াছেন, "সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষিতম্। পাণিপাত্রোদরমাত্র মক্ষিকেব ন সংগ্রহী।" অর্থাৎ প্রকৃত ভক্তগণ সায়ংকালে বা কল্য কি আহার করিব, ইহা ভাবিয়া ভিক্ষাদ্রব্য সঞ্চয় করেন না। মক্ষিকা যেরূপ কিছুই সঞ্চয় করে না, তদ্রূপ তাঁহারা স্বীয় উদরমাত্র পূর্ণ হইলেই পরিতৃপ্ত হয়েন। ভক্তগণ আপনাদিগের সমুদায় ভার জগজ্জননীর স্কন্ধে চাপাইয়া নিজে প্রফুল্ল-চিত্তে জীবের সেবা করিয়া বেড়ান। জীবের সেবাতেই ভগবানের সেবা হয়। ভক্ত ভগবানের সেবা করেন, সুতরাং ভগবানকেও ভক্তের সেবা করিতে হয়। ভক্ত এবং ভগবানের মধুর সম্বন্ধ সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। ভক্তের সমুদায় কামনা ভগবান পূর্ণ করেন, সেইজন্যই তাঁহার নাম ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। কিন্তু ভক্ত কখনই সৃষ্টিছাড়া ধনমানের জন্য প্রার্থনা করেন না। অনাহারে প্রাণ গেলেও তিনি অন্নের জন্য প্রার্থনা করেন না। কেবল কৃতাঞ্জলিপুটে সরল অন্তরে বলেন, "প্রভো।

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যুধিষ্ঠির এবং ঈশা প্রভৃতির জীবন ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। তবে যদি তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি ভক্তের ধনমানের আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করিতে পারেন।

প্রবোধ। তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা না মিলিলে যদি প্রার্থনা পূর্ণ না হয়, তবে আর কি হইল?

যোগানন্দ। যিনি ভগবানকে ভালবাসেন, তাঁহার ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছার সহিত মিলিবেই মিলিবে। যদি কোথাও না মিলে, তাহা হইলে সেখানে তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার ইচ্ছার সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছার মিলন হইল না। বুঝিতে পারিলেই তিনি সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।

প্রবোধ। আমার ইচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছা না মিলিলে যদি আমার উপকার না হয়, তবে প্রার্থনার আবশ্যকতা কি?

যোগানন্দ। প্রার্থনা না করিলে তাঁহার ইচ্ছা কি, তাহা বুঝা যায় না। সাধন-বলে তাঁহার ইচ্ছা বুঝিয়া প্রার্থনা কর, বাঞ্ছাকল্পতরু হরি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেনই করিবেন। যাহাতে তোমার কল্যাণ, তাহা তিনি মুক্ত হস্তে বিতরণ করিবেন। এবিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় রাখিও না।

গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া প্রবোধ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং যোগানন্দ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ষষ্ঠ দিবস।

প্রবোধ যোগানন্দকে বলিলেন, "গুরুদেব! আমি এতদিনে বুঝিলাম শ্রীহরির প্রেম বিনা আমার প্রার্থনার বস্তু আর কিছুই নাই। জীবন যৌবন অর্পণ করিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাকিলে তিনি কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ধন মান বিষয় বিভব লইয়া কি করিব? আমি এখন তাঁহার একমাত্র অমূল্য প্রেম-সুধার ভিখারী। আপনি অদ্য আমাকে প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করুন।"

যোগানন্দ বলিলেন, "শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবে শ্রীহরির উপাসনা করাই প্রেম-সাধনা। সকলের অপেক্ষা মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ ভাব। এই ভাবে জীবকে একেবারেই ভগবানের অধীন করিয়া দেয়। সতী যেমন আপনার পতি ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না, মধুর ভাবের উপাসকও তেমনই ভগবান ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না। যতক্ষণ সংসারের একবিন্দু বস্তুর উপরও এককণা ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ প্রেমসাধনা হয় না। তোমার ধন প্রাণ, জাতি মান, ধর্ম্ম কর্ম্ম, ইহকাল পরকাল, সকলই শ্রীহরির চরণে অর্পণ করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাকে ভালবাসিয়াই তোমাকে সুখী হইতে হইবে। তাঁহার হস্তের প্রহার খাইয়াও শুদ্ধ তাঁহারই মুখপানে চাহিয়াই তোমাকে তৃপ্তি লাভ করিতে হইবে। তাঁহার প্রীত্যর্থে হৃৎপিণ্ড তুলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে অর্পণ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইতে হইবে এবং ক্রুশকাষ্ঠে উঠিয়া ঈশার ন্যায়

"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সর্ব্বস্ব প্রাণেশ্বরের চরণে উৎসর্গ না করিলে প্রেম-সাধনা হয় না। যে আপনার জন্য এক বিন্দুও সুখ রাখে, সে অসতীর ন্যায় কলঙ্কভাজন হয়। প্রেমে আমিত্ব থাকে না। প্রেমিক আপনাকে মোটেই দেখেন না; তিনি শয়নে স্বপনে চক্ষের সম্মুখে কেবল হরিরূপই দর্শন করেন। জলে স্থলে অনলে অনিলে হরি দেখিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত করেন। আকাশে ও ভূতলে তিনি হরি বিনা আর কিছুই দেখেন না। জড় জীব তরুলতায় তিনি সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ শ্রীহরিকেই সন্দর্শন করেন। প্রেমিক প্রেমময়ের চরণে চিরবিক্রীত হইয়া চিরদিন তাঁহারই সেবা করিয়া জীবন সার্থক করেন। বৎস প্রবোধ! এই প্রেমশাস্ত্র অনন্ত, এখন তোমাকে কত বলিব বল? ভগবানের পদে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হও। তিনি আপনিই তোমার হৃদয়ে প্রাণেশ্বর রূপে উদিত হইয়া সমুদায় লীলা প্রকাশ করিবেন।" এই বলিয়া যোগানন্দ আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

প্রবোধের বীণা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নাম গাহিতে আরম্ভ করিল। নামের গুণে সাধকের প্রাণে সাধনা জমাট বাঁধিয়া গেল। প্রবোধচন্দ্র বলিলেন, "প্রাণেশ্বর! আমি তোমার প্রেম বিনা আর তোমার কাছে কিছুই চাহি না। আমার ধন মান সুখে কাজ নাই। আমি তোমাকে ভালবাসিয়াই সুখী হইতে চাই। আহা ঠাকুর! তুমিই বিশ্বসংসারের একমাত্র কর্ত্তা, আমি তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব?

ধন বল সম্পদ বল কেহই ত আমাকে ভবসঙ্কটে উদ্ধার করিতে পারিবে না। তবে আমি তাহাদিগকে লইয়া তোমাকে ভুলিব কেন? প্রেমময়! তুমিই কেবল আমার একমাত্র গতি মুক্তি ভরসা। তুমি আমাকে যেমন রাখ আমি তেমনই থাকি। আমি সুখও বুঝি না দুঃখও বুঝি না; আমি কেবল তোমার প্রেমমুখ দেখিয়াই জন্ম সফল করিতে চাই।"

ক্রমে বেলা অবসন্ন হইয়া আসিল। সত্যসখা আসিয়া প্রবোধচন্দ্রের সমাধি ভঙ্গ পূর্ব্বক বলিল, "দাদা। অদ্যকার সাধনা শেষ হইয়াছে, এখন আশ্রমে চল। বৃন্দাবন হইতে একজন প্রেমিক বৈষ্ণব আসিয়াছেন, সন্ধ্যার পরে তিনি হরিপ্রেমলীলা কীর্ত্তন করিবেন; আমাদের সকলকেই তাহা শ্রবণ করিতে হইবে।" প্রবোধচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ! কে ও? সত্যসখা! একটী হরিপ্রেমের গান কর দেখি।" সত্যসখা গাহিল—

"কত দিনে হবে প্রেমের সঞ্চার। হয়ে পূর্ণকাম, বল্‌বো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।

কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন, সংসার বন্ধন, হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।"

প্রবোধচন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে গাহিলেন—

"কবে পরশমণি করে পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন, হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার।"

প্রবোধচন্দ্র আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। সত্যসখা গাহিল,—

"হায়! কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাতিকুলের ভরম, কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার।"

প্রবোধচন্দ্র ভাবে বিহ্বল হইয়া সত্যসখার মুখচুম্বন করিলেন। সত্যসখার চক্ষে কি জানি কেন ঝর ঝর করিয়া জল পড়িল। সে চক্ষের জল মুছিয়া গাহিল—

"মাখিব সর্ব্বঅঙ্গে ভক্তপদধূলি, কাঁধে লয়ে চিরবৈরাগ্যের ঝুলি, পিব প্রেমবারি দুহু হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম-যমুনার।"

প্রবোধচন্দ্র ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল। নয়নে দরবিগলিতধারে প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল। সত্যসখা তাঁহার হস্ত ধরিয়া উত্তোলন পূর্ব্বক গাহিল—

"প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব, আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার।"

গাহিতে গাহিতে দুইজনে আশ্রমে গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন আশ্রমস্থ ঋষিবৃন্দ বৃন্দাবন হইতে আগত বৈষ্ণবকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক কীর্ত্তন শুনিতেছেন। বৈষ্ণব গাহিতেছেন—

"ওহে হরি প্রেমরসময়, কি আর বলব তোমায়,
কত সাধে হয় কতসময়।

তন্ময় জগত হেরি, নয়নে ঝরিবে বারি,
প্রেমে অঙ্গ উঠিবে শিহরি ;
হৃদিমাঝে নিরবধি, বহিবে প্রেমের নদী,
উথলিবে আনন্দ লহরী।"

উন্মত্ত প্রবোধ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে আরও উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কীর্ত্তনিয়া গাহিলেন—

"ঐ সুন্দর পুলিনে, প্রেমকুসুমোদ্যানে,
প্রেমফুল হবে বিকসিত ;
প্রেমিক বিহঙ্গগণ গাহিবে তোমার গুণ,
মধুগন্ধে হইয়ে মোহিত।"

যোগানন্দাদি ঋষিগণের চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সত্যানন্দ একতারা বাজাইয়া নাচিতে লাগিলেন। ঋষিপত্নীগণ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। গায়ক গাহিলেন—

"সুখময় সুশীতল, সুমন্দ মলয়ানিল,
পরিমল করিবে বহন ;
সুবিমল প্রেমশশী, বরষিবে সুধারাশি,
সুধাময় হইবে ভুবন।"

প্রবোধ একেবারে অচেতন হইয়া গেলেন। তাঁহার প্রাণের মধ্যে শত চন্দ্র উদিত হইয়া স্নিগ্ধ কিরণরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল, প্রেমে শরীর রোমাঞ্চিত হইল। নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তিনি জ্ঞানহারা হইয়া সমাধি-সিন্ধুতে ডুবিয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে প্রেমভরে বলিলেন, "তোমার পায় পড়ি হরি! আমাকে আর

কাঁদাইও না। যদি ঘরে এলে, এত শীঘ্রই আবার যাবে কেন? তাহা হইলে আমার ঘর যে আবার অন্ধকার হবে? আমি কি লইয়া থাকিব? ওরকম আঁধার কুটীরে আমি থাকিতে পারিব না। তুমি শত গোলাপের মালা গাঁথিয়া আমার গলায় দিবে? সে ত শুকাইয়া যাইবে! শত চন্দ্রের হার আমার কণ্ঠে পরাইবে? সে ত অমানিশায় নিবিয়া যাইবে? ওসব আমি চাই না, ওসব গহনা আমি পরিব না। আমি যা চাই তা আমাকে দেবেত? সত্য বলিতেছ দেবে? তিনবার বল দেবে? আমি চাই—

"হৃদয় পরশ মণি আমার। নয়নের ভূষণ আমার তব দরশন, বদনের ভূষণ আমার তব গুণ কীর্ত্তন। (ভূষণ বাকী কি রবে হে, জগচ্চন্দ্রহার পরিব)

হস্তের ভূষণ আমার চরণ সেবন, কর্ণের ভূষণ আমার তব নাম শ্রবণ। (ভূষণ বাকী কি রবে হে,—প্রেমমণিহার পরিব)"

গাহিতে গাহিতে আবার যোগনিদ্রায় মিলাইয়া গেলেন।

সপ্তম দিবস।

ঐ দেখ আপনহারা সাধক অবাক্ হইয়া লতামণ্ডপে বসিয়া আছেন। প্রেমে অঙ্গ পুলকিত ও নয়নযুগল চঞ্চল হইয়াছে। গুরুদেব কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা মনে নাই। হঠাৎ বিবেক আসিয়া বলিলেন, "প্রবোধ! যাঁহার দিকে অমন করিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছ, দেখ দেখি উনি কত নির্ম্মল! চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, গোলাপে

কণ্টক আছে, কিন্তু ও চন্দ্রে কি কলঙ্ক দেখিতেছ, না ও গোলাপে কণ্টকের সন্ধান পাইয়াছ?” প্রবোধ উন্মত্তবৎ শুষ্কমুখে বিবেকের মুখের দিকে চাহিলেন। বিবেক আবার বলিলেন, “জান না, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ শ্রীহরির এই রূপে এই ভাবে সংসারের সমুদয় শোক তাপ দূরে যায়। ইহলোকে কি পরলোকে এমন কোন দুঃখ নাই, যাহা ইহাঁকে দেখিলে নিবারণ না হয়। এই রূপে পুত্রশোকাতুরা উন্মাদিনী জননী সান্ত্বনা লাভ করেন, এই রূপে পতিহারা পাগলিনী শান্তিসুখ সম্ভোগ করেন এবং এই রূপে ভীষণ কালকবলে পতিত আত্মা চিরবিরাম প্রাপ্ত হয়েন। প্রবোধ! দেখ দেখ, কি চমৎকার শুদ্ধ এবং শান্তিময় রূপ! এ রূপ দেখিলে এক দিকে মহাপাপী পরিত্রাণ পায়, আর এক দিকে পরিশ্রান্ত আত্মা শান্তি লাভ করে। জগাই মাধাই কি সাধ করিয়া ভুলিয়াছিল? না শাক্যসিংহ ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন? এ রূপের এমনই মোহিনী শক্তি যে, একবার দেখিলেই চণ্ডাল দেবতা হয়, পাষণ্ড দ্রবীভূত হয় এবং নীরস প্রাণে রসের সঞ্চার হয়।”

প্রবোধ এ সকল কথা শুনিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু বিবেকের কথার কোন উত্তর না দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার আকৃতিতে উন্মত্তের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দুবাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন এবং নাচিতে নাচিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাঁহাকে পড়িতে দেখিয়া অন্তরীক্ষ হইতে বৈরাগ্য এবং হরিপ্রেম

আবির্ভূত হইয়া বিবেকের সঙ্গে তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। হরিপ্রেম বলিলেন, "এ যে মহাভাবের মূর্চ্ছা! ইহা ত প্রেমময়ের নাম গান ভিন্ন কখনই ভাঙ্গিবে না। অতএব এস সকলে মিলিয়া প্রবোধকে লতাকুঞ্জে শয়ন করাইয়া হরিনামকীর্ত্তন করি।" তাঁহার কথায় সকলে প্রবোধকে সেই সাধন কুটীরের মধ্যে পুষ্পশয্যায় শয়ন করাইয়া দেবদেবী মিলিয়া প্রবোধের হস্তনিক্ষিপ্ত একতারা লইয়া দেবকণ্ঠে হরিনামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নাম শুনিতে শুনিতে প্রবোধের চৈতন্যলাভ হইল। দুই চক্ষু মেলিয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। চাহিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। বিবেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রবোধ! অত হাসিতেছ কেন?" প্রবোধচন্দ্র উত্তর দিলেন, "তোমরা কি দেখিতেছ না যে, আমি মায়ের কোলে উঠিয়াছি? আহা! মা আমায় বড়ই ভালবাসে। তোমরা আমার মায়ের কোলে উঠিবে? এস না ভাই, সবাই মিলে আমার মায়ের কোলে উঠিয়া এক সঙ্গে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকি।"

বিবেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ তোমার মা কৈ? আমরা ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না?" প্রবোধ আবার খিল্ খিল্ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমার এমন হাস্যবদনা জীবন্ত মাকে তোমরা দেখিতে পাইতেছ না? এই যে! এই যে! এই যে মা হাসিতেছেন। দেখ দেখ! ঐ দেখ, মায়ের মুখশ্রীতে কেমন এক অপূর্ব্ব দিব্য লাবণ্যচ্ছটা ক্রীড়া করিতেছে। নিরাকারা মায়ের এত রূপ! দেখ বিবেক, দেখ বৈরাগ্য! প্রাণ ভরিয়া

দেখ। হরিপ্রেম! কর কি? কর কি? ধর ধর, মাকে ধর। এই যে মা আমার সম্মুখে নাচিয়া নাচিয়া হাসিতেছেন। একবার ধরি। আহা! আকাশের চাঁদকে নিকটে পেয়েছি, একবার ধরি। আয় মা! আয় মা! ছেলে হাত বাড়ায়েছে একবার ধরা দে মা!” বলিতে বলিতে দুই হাত বাড়াইয়া প্রবোধচন্দ্র এদিকে ওদিকে ছুটিতে লাগিলেন। হরিপ্রেম বলিলেন, “বিবেকবৈরাগ্য! তোমরা দাঁড়াইয়া দেখিতেছ কি? প্রবোধ এখনই আবার মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িবে। এই সময় উঁহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখ।” বিবেক বলিলেন, “ভক্তের এ প্রেমোন্মত্ততার নিকটে আমি দাড়াইতে পারি না। এই দেখ আমি ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি।” বৈরাগ্য উত্তর দিলেন, “ভক্তবৎসল এইরূপেই ভক্তহৃদয়ে লীলা করেন, তাঁহাকে বাধা দেওয়া আমাদের কার্য্য নহে। শ্রীগৌরাঙ্গের ভিতরে থাকিয়া শ্রীহরি যখন তাঁহাকে আবেশে উন্মত্ত করিয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত করিতেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গকে কেহই ধরিয়া রাখিতে পারিত না।”

প্রবোধচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, “মা! মা! সংসারের মা! এমন সময়ে তুমি কোথায়? আমার স্বর্গের মা এসেছেন, তুমি একবার দেখিলে না? আহা মা! যদি তুমি একবার দেখিতে, তাহা হইলে তোমার মানবীজন্ম সার্থক হইত। পিতা! পিতা! তোমায় বড়ই ভালবাসি, তুমিও এ সময় কাছে নও! আহা বাবা! তুমিও একবার এমন রূপ দেখিলে না? ওরে ভাই রামদাসশ্যামদাস!

তোরাও একবার এ রূপ দেখিলিনে? ওরে! তোদের যে বড়ই ভালবাসিতাম, একটু ভাল জিনিস পাইলে যে তোদের না দেখাইয়া স্থির থাকিতে পারিতাম না। তবে আজ এমন দেবদুর্ল্লভ হরিধনকে তোদের না দেখাইয়া স্থির থাকি কিরূপে?"

বিবেক বলিলেন, "প্রবোধ! রামদাস ও শ্যামদাস যে তোমার শত্রু, তবে তাহাদের জন্য অমন করিতেছ কেন?" প্রবোধচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "কি? কি? শত্রু কি? শত্রু কাহাকে বলে?" বিবেক উত্তর দিলেন, "যে তোমার ক্ষতি করে, সেই তোমার শত্রু। রামদাস ও শ্যামদাস তোমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক তোমাকে প্রহার করিয়া বনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহারা যে তোমার ঘোর শত্রু।" প্রবোধচন্দ্র আবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি পাগল হইয়াছ। আমি যে মায়ের কোলে রহিয়াছি, তবে আমার ক্ষতি করিবে কে? আমি যে অমর, তবে আমাকে মারিবেই বা কে? জাননা—"বলিয়াই গাহিলেন—

"আমি মা আনন্দময়ীর ছেলে কারেও নাহি ডরি।
বেড়াইব হেসে খেলে মায়ের অঞ্চল ধরি।
কি ভয় মরণে রণে, কি করিবে শত্রু গণে,
আছেন জননী মোরে দিবানিশি কোলে করি।"

গান বন্ধ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, আয় ভাই রামদাসশ্যামদাস! তোদের একবার আলিঙ্গন করি। আহা! অনেক দিন তোদের দেখিনি। ভাই! তোরাও আমার মায়ের ছেলে, আমিও আমার মায়ের

ছেলে; তবে আর ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করি কেন? তোরা আমাকে মেরেছিস্? মেরেছিস্ মেরেছিস্, তাতে আমার কিছুই ক্ষতি হয় নাই। আমি তোদের সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছি। এই যে! মা আবার আর এক রূপে এসেছেন! ও কি! চন্দ্রসূর্য্য নিবিয়া গেল কেন? ওরা বুঝি মায়ের রূপের কাছে দাঁড়াইতে পারিল না? মা বুঝি এতদিনে কোটিচন্দ্র ও কোটিসূর্য্যবিনিন্দিত মাধুরী প্রকাশ করিয়া চন্দ্রসূর্য্যের দর্প চূর্ণ করিলেন। ও গো! তোমরা শঙ্খঘণ্টা বাজাও না, মা ঘরে এলেন, মাকে বরণ করে ঘরে লও না। তোমরা সকলে চুপ করে আছ যে? মাকে বুঝি তোমরা ভালবাসনা? এস না সকলে মিলিয়া মাকে পূজা করি। তোমরা কেউ ফুলচন্দন আননি? তবে কি দিয়ে মায়ের পূজা হবে? না, না, মাকে ত বনের ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করা হবে না। প্রেম-ফুল আর ভক্তিচন্দনে মায়ের শ্রীচরণ পূজিতে হইবে। আঃ! এখন কবি কি? যাই কোথায়? কোন্ বনে প্রেম-ফুল ফোটে কেউ বলিতে পার? ঐ যে কে বলিতেছে—'হৃদয় বনে'। বেশ হইয়াছে, তবে আর ছুটাছুটি করিতে হইবে না। হৃদয়-বনটা ছিঁড়ে মায়ের পাদপদ্মে দিলেই হবে। ও কি? ও কি? মা! ও মা! এখনই যে চলিলে? এখনও যে তোমার পূজা হয় নি? যেও না, যেও না, মা! যেও না। তোমার পায় পড়ি, একটীবার দাঁড়াও, ভাল করিয়া তোমাকে একবার দেখিয়া লই।" বলিতে বলিতে প্রবোধ-চন্দ্র আবার অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। দেবতাত্রয়

নিকটে গিয়া দেখিলেন, সর্ব্বশরীর কণ্টকিত, দুই চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রুপাত হইতেছে। ডাকিলেন, কোনই উত্তর পাইলেন না। আবার সকলে মিলিয়া নাম গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা গাহিলেন—

"দীনজনে ডাকে গো মা জগতজননি!
দরশন দে মা আসি ভুবনমোহিনি!"

নামের গুণে প্রবোধের আবার চৈতন্য লাভ হইল। চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই আমার মা কই? কই আমার ত্রিভুবনেশ্বরী কই? কই আমার আনন্দময়ী কই? এই যে তোমরা 'মা' 'মা' বলিতেছিলে, তবে মা আবার কোথায় গেলেন? উঃ! আমার প্রাণ যে মাতৃ-বিরহে ফেটে গেল। আয় মা! আর একবার আয় মা! তোর কাঙ্গাল ছেলে ডাকে, আর একবার দেখা দে মা! নৈলে যে প্রাণে মরি।" এইরূপে চীৎকাররবে মাকে ডাকিতে লাগিলেন। ডাকিতে ডাকিতে দিবাভাগ শেষ হইয়া আসিল। পূর্ব্বগগনে একটু একটু অন্ধকার দেখা দিতে লাগিল। আশ্রম হইতে সত্যানন্দ সাধন-কুটীরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই বিবেক, বৈরাগ্য ও হরিপ্রেম অন্তর্হিত হইলেন। সত্যানন্দ প্রবোধের দশা দেখিয়া বলিলেন, "আহা! মা পতিতপাবনীর কি চমৎকার লীলা! যে প্রবোধ একদিন মদ্যপানে, ব্যভিচারে, নাস্তিকতায় এবং বিলাসে একেবারে ডুবিয়াছিল, সেই প্রবোধ আজ একেবারে জীবন্মুক্ত! আজ মায়ের নামের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

প্রবোধ রে! ভাই! তুই ধন্য হয়েছিস্। আয় ভাই, তোরে একবার আলিঙ্গন ক'রে দেহটাকে পবিত্র করি"। বলিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবোধকে জড়াইয়া ধরিলেন। প্রবোধচন্দ্রও চীৎকাররবে কাঁদিতে কাঁদিতে সত্যানন্দের গলা জড়াইয়া বলিলেন, "ভাই সত্যানন্দ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মা দেখা দিয়া আবার কোথায় লুকাইয়াছেন। আমি কতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলাম, তথাপি আর আসিলেন না।" সত্যানন্দ বলিলেন, "লীলাময়ীর লীলাই এইরূপ। তিনি দীন সাধককে একবার দর্শন দেন, আবার অদর্শনে কাঁদান। শ্রীগৌরাঙ্গ একবার তাঁহার দর্শনে হাস্য করিতেন, আবার অদর্শনে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেন। মহম্মদ তাঁহার বিরহে সময়ে সময়ে পর্ব্বতের উপরে মুখ ঘর্ষণ করিয়া ক্রন্দন করিতেন। ভাই প্রবোধ! তোমার এ অবস্থা দুঃখের নহে, এই অবস্থাই প্রকৃত সুখের অবস্থা। এখন তাঁহাকে হারাইয়া কাঁদিতেছ, আবার ক্ষণকাল পরেই তাঁহার দর্শনে আনন্দে হাস্য করিবে।" বলিতে বলিতে তিনি প্রবোধকে লইয়া আশ্রমের দিকে চলিয়া গেলেন।

অষ্টম দিবস

বটবৃক্ষমূলে অজিনাসনে বৃদ্ধ মহর্ষি যোগানন্দ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সত্যানন্দ প্রবোধচন্দ্রের হস্তধারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহর্ষে প্রেমময়ের প্রেমে প্রবোধ আত্মহারা। কখন হাস্য করিতেছে,

কখন ক্রন্দন করিতেছে, কখন নৃত্য করিতেছে, আবার কখন ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া হাহাকার করিতেছে। দেখুন, মহাভাবের সমুদায় লক্ষণই ইহার শরীরে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সংস্পর্শে আমার পাপদেহ পবিত্র হইল। প্রবোধচন্দ্র আশ্রমের একটী নূতন অলঙ্কার।" কথা সমাপ্ত করিয়া দুইজনেই প্রণাম পূর্ব্বক যোগানন্দের পদমূলে উপবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধ মহর্ষি আশীর্ব্বাদান্তে প্রবোধকে কহিলেন, "প্রবোধচন্দ্র! করুণাময় শ্রীহরির কৃপায় তুমি ধন্য হইলে। অনুরাগে ও প্রেমে তুমি যেমন পাগল হইয়াছ, জগতে এরূপ পাগল অতি অল্প লোকেই হইয়া থাকে। কয়েক দিনের সাধনেই তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ। এক্ষণে তোমাকে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে। শাস্ত্রপাঠ না করিলে নানা সাধুভক্তের মুখবিগলিত অমৃতময় উপদেশ সকল জানা যায় না। যেমন সরল ভক্তি ও বিশ্বাসে দিবানিশি প্রার্থনা এবং নাম গান করা আবশ্যক, তেমনই শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্মগ্রন্থ সমুদায়ও পাঠ করা উচিত। জলে স্থলে আকাশে শ্রীহরির লীলা যেমন প্রকাশিত, ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের মধ্যেও তেমনই তাঁহার খেলা প্রকটিত। সেইজন্যই সাধকের নিকটে ধর্ম্মশাস্ত্র চিরকালই অমূল্য বস্তু। অতএব নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া প্রত্যহ শাস্ত্রপাঠ করিতে আরম্ভ কর। এ জগতে যত ভাষায় যত ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, সকলই পাঠ করিতে হইবে। হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়া যে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, তাহা হইবে না। সকল বিভিন্ন শাস্ত্রের

মা

হইয়াছে। সেইজন্যই ভাগবতকার বলিয়াছেন—"অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ।" অর্থাৎ ভৃঙ্গ যেরূপ সকল পুষ্প হইতেই সার গ্রহণ করে, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল শাস্ত্র হইতেই সার গ্রহণ করিবেন। আর ভাবিয়া দেখ, সকল শাস্ত্রেই সেই একই ভগবানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রের মধ্যেই ধর্ম্মকথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ধর্ম্ম যাহা তাহা সকল জাতিরই সাধারণ সম্পত্তি। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ হইতে পারে না। সেইকারণেই বন-পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, "ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ। অবিরোধাত্তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রম।" অর্থাৎ যে ধর্ম্ম সহকারে অন্য ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হয়, সে ধর্ম্ম ধর্ম্ম নয়, তাহা কুধর্ম্ম। বিরোধপরিহারযুক্ত যে ধর্ম্ম তাহাই ধর্ম্ম। অতএব ঘৃণা বা বিদ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রই পাঠ করিতে আরম্ভ কর। সকল শাস্ত্র হইতে জ্ঞানলাভ করিলেই প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারিবে। নতুবা সাম্প্রদায়িক যে জ্ঞান তাহা জ্ঞানই নহে। হৃদয়টাকে আকাশের ন্যায় প্রশস্ত করিয়া উদার-ভাবে জগতের সকল মানবজাতিরই জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তিবিষয়ক রচনা সমুদায় পাঠ করিয়া প্রকৃত শান্তি লাভ কর। এবং হিন্দু, যবন, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই শ্রীহরির সুন্দর লীলা সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও।"

গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া প্রবোধচন্দ্র অধ্যয়নে রত হইলেন। না:

পড়িতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দুদিগের যোগ, ভক্তি ও বৈরাগ্য, মুসলমানদিগের ধর্ম্মোন্মত্ততা এবং খ্রীষ্টিয়ানদিগের বিশ্বাস ও প্রার্থনাবিষয়ক শাস্ত্র সকল পাঠ করিয়া প্রবোধের মন নিত্য নূতন নূতন ভাবে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। তিনি কখন নাম গান করেন, কখন প্রার্থনা করেন, কখন শাস্ত্রপাঠ করেন, আবার কখন বা নির্জ্জনে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বসিয়া থাকেন। কখন ঋষিমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া শাস্ত্রবাক্য সকল আলোচনা করেন, কখন বৃক্ষের তলায় তলায় লতার কুঞ্জে কুঞ্জে একতারা বাজাইয়া বনের পাখীর মত হরিগুণ গান করিয়া বেড়ান, কখন বা ভক্তিরসে পাগল হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মত ধূলায় গড়াগড়ি দেন, আবার কখন বা মহাযোগীর মত বনের মধ্যে গভীর সমাধিতে ডুবিয়া থাকেন। তাঁহার সাধনা দর্শনে আশ্রমস্থ ঋষিগণ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আবার কি ধ্রুব আসিলেন? না আবার দেবর্ষি নারদ আসিলেন? এত নিষ্ঠা এত বিশ্বাস এত উন্মত্ততা ত কাহারও সহজে হয় না। প্রবোধের চরিত্রে নিশ্চয়ই ব্রহ্মচরিত্র মিশিয়াছে, প্রবোধের জীবনে নিশ্চয়ই হরিলীলার বায়ু বহিতেছে। ইত্যাদি প্রকারে ঋষিগণ পরস্পর আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ যোগানন্দ প্রবোধকে আর একদিন নিকটে ডাকিয়া উপদেশ দিলেন, "বৎস! আধ্যাত্মিক সাধনে উন্মত্ত হইয়া শরীরকে অগ্রাহ্য করিও না। শরীর অসুস্থ হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে আত্মার উন্নতিও অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। যদিও দুদিন পরে শরীর নষ্ট হইয়া যাইবে, তথাপি ভগবান

শরীরটাকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য এত আদরে এমন সুন্দর করিয়া রচণা করেন নাই। শরীর তোমার আত্মার আধার। অতএব শরীরটাকে সর্ব্বাগ্রে সুস্থ রাখিতে যত্ন করিবে। নতুবা আত্মা কখনই সুস্থ থাকিবে না। নিয়মিত পরিশ্রম, নিয়মিত আহার এবং নিয়মিত বিশ্রাম চাই। যতদিন শরীর আছে, ততদিন শরীরটাকে রাখিতেই হইবে। এই শরীরে ব্রহ্মশরীর বিমিশ্রিত। শরীরের সেবায় হরির সেবা হয়। পীড়িত শরীরের সেবা করিলে ভগবানের সেবা করা হয়। ক্ষুধিত শরীরকে অন্ন দিলে তাহা ভগবানকে দেওয়া হয়। আবার শরীরকে প্রহার করিলে ভগবানকে প্রহার করা হয়। অতএব যেমন নিজের শরীর তেমনই পরের শরীরের প্রতিও যত্ন ও সম্মান করিবে। তুমি শরীরী হইয়া কাহারও শরীরকে অগ্রাহ্য করিতে পার না। ক্ষুদ্র ও মহান্ সমুদায় শরীর একত্র হইয়া সেই অশরীরী ব্রহ্ম-শরীর প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব কীট পতঙ্গ হইতে দেবশরীর পর্য্যন্ত সকলকেই পরব্রহ্মের শরীর বলিয়া সম্মান প্রদান করিবে।

কিছুদিন পরে আবার শিষ্যকে ডাকিয়া গুরু উপদেশ দিলেন, "বৎস! এ সংসারের বাহ্য চাক্‌চিক্যে মোহিত হইও না। ধন মান বিষয় বিভব গাড়ী ঘোড়া বাড়ী ঘড়ি ইত্যাদি দেখিয়া ঐ সমুদায় বস্তুতে লোভ করিও না। ও সকল বিলাসের সামগ্রীতে কিছুমাত্রও সার নাই। কেবল বাহিরেই উহাদের জাঁকজমক। রামায়ণে সোণার হরিণের কথা শুনিয়াছ; ধন মান গাড়ী, ঘড়ি এবং অট্টালিকা

প্রভৃতিই ঐ সোণার হরিণ। বাহিরের ছটায় মুগ্ধ করিয়া সাধককে তাঁহার প্রাণেশ্বর ঈশ্বর হইতে ভুলাইয়া পাপের রাজ্যে নরকের দেশে লইয়া যায়। অতএব শাকান্ন এবং সামান্য পরিচ্ছদেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে। সোণার হরিণের প্রতি ভুলিয়াও তাকাইও না। সর্ব্বদাই আপনার প্রাণের প্রিয় দেবতার প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবে। জীবহত্যা অপেক্ষা মহাপাপ আর কিছুই নাই। রাজ্য-লোভে, ধনলোভে অথবা মাংসলোভে যাহারা জীবহত্যা করে, তাহারা নরাকারে পশুবিশেষ। অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত আছে, "স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি। নাস্তি ক্ষুদ্রতরস্তস্মাৎ সুনৃশংসতরো নরঃ।" অর্থাৎ যে পর-মাংস ভক্ষণ করিয়া আপন দেহের পুষ্টিসাধন করিতে চায়, তাহার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও নৃশংস ব্যক্তি আর কুত্রাপি নাই। মানবদেহ রক্ষার জন্য পালয়িতা বিধাতা অনন্ত দিকে অনন্ত প্রকার খাদ্যসামগ্রী সজ্জিত রাখিয়াছেন, সুতরাং উহার জন্য পরমাংস ভোজন করা নিতান্তই মহাপাপ। বিশেষতঃ যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি ভগবানকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, তিনি সমুদায় জীবকেই আত্মবৎ প্রীতি করেন। জীবে প্রেম না হইলে ব্রহ্মে প্রেম কখনই হইতে পারে না। সেইকারণেই দেখা যায়, প্রেমিকগণ অনেক সময়ে জীবের প্রেমে একান্তই বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। এক সময়ে দিবা মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণদিগের ভোজনের জন্য প্রস্তুত সমুদায় অন্ন ব্যঞ্জনাদি কুক্কুর কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইয়া নষ্ট হইতেছে দেখিয়াও সাধু জড়ভরত কুক্কুরকে প্রহার না করিয়া স্থিরভাবে বলিয়া-

ছিলেন, এবং অন্য সময়ে রঘুগণ রাজার পাল্কিবহনকালে পদদলনে পিপীলিকা বিনাশ আশঙ্কায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। যিনি ভগবানকে এককণা প্রীতি প্রদান করেন, তিনি সেই ভগবানের প্রিয় জীবকে কথনই ক্লেশ দিতে পারেন না। অতএব সাবধান! যেন তুচ্ছ উদর পরিপোষণের জন্য ঈশ্বরের স্বহস্ত রচিত জীবের প্রাণনাশ করিও না।”

একদিন উষার নবোদিত আলোকে প্রবোধচন্দ্র আপন শয়ন-কুটীরের দ্বারদেশে এক দিব্যমূর্ত্তি বালককে দর্শন করিয়াই সচকিতে গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিলেন, বালকের অপরূপ রূপ-জ্যোতিতে কুটীর আলোকিত হইয়াছে। গলদেশে দোদুল্যমান পুষ্পহারের মধুপান আশায় কয়েকটী মধুকর গুণ্ গুণ্ ধ্বনি করিতে করিতে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উপবেশন করিতেছে। প্রভাতসমীরণ তাঁহার কুঞ্চিত চাঁচর কেশদাম লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করিতেছে। এবং মস্তকের মুকুটস্থ উজ্জ্বল মণির আভায় দশদিক সমুজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছে। প্রবোধচন্দ্র তাঁহার সেই ঢলঢলায়মান অপূর্ব্ব মুখশ্রীর দিকে অতৃপ্ত নয়নে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। যেন কোথায় এই স্বর্গীয় লাবণ্য দেখিয়াছেন বলিয়া অল্প অল্প বোধ হইতে লাগিল। তাঁহাকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বালক বলিলেন, “প্রবোধচন্দ্র! অমন করিয়া কি দেখিতেছ? আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না? আমি দেবদূত। এতদিন তোমার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্যভাবে ছিলাম, আজ

ভগবানের আদেশে আবার প্রকাশিত হইয়াছি। তোমার সাধনায় সিদ্ধিদাতা শ্রীহরি বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে এই আনন্দ-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে কিছুকাল দেশভ্রমণ করিতে হইবে। এক স্থানে থাকিয়া যত সাধনা হইতে পারে, তোমার তাহা হইয়াছে; এক্ষণে বহুদর্শিতা লাভ করিবার জন্য সাধনা জীবনে চিরস্থায়ী করিবার জন্য নানা দেশ ভ্রমণ এবং নানা তীর্থ পর্য্যটন করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে। অতএব শ্রীহরির আদেশে অদ্যই একতন্ত্রী, মৃগচর্ম্মের আসন এবং কমণ্ডলু ধারণ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হও। সঙ্গে এককণা তণ্ডুলও সম্বল করিয়া লইতে পারিবে না। ক্ষুধার সময়ে দেবী অন্নপূর্ণা তোমাকে অন্ন যোগাইবেন। নির্ভয় হইয়া হরিনামমাত্র সম্বল পূর্ব্বক ভ্রমণে প্রবৃত্ত হও, নানা স্থানের নব নব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদর্শনে বিশ্বস্রষ্টার মহিমা উপলব্ধি করিয়া সুখী হও এবং নানা দেশের নানা সাধু ভক্তের দর্শনে ও সহবাসে নির্ম্মল শান্তি সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হও। পথিমধ্যে বিপদে পড়িলে বিপদ-ভঞ্জনের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিও, তাহা হইলেই সমুদায় বিপদ নিরাকৃত হইবে। জানিও, অলক্ষিতে আমি তোমার সঙ্গে রহিলাম।" এই বলিয়াই দেবদূত শূন্যমার্গে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

প্রবোধচন্দ্র গুরুদেব যোগানন্দকে সমুদায় সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। গুরুদেব বলিলেন, "বৎস! তুমি ধন্য হইলে। ভগবান তোমার উপরে নিতান্তই সদয় হইয়াছেন। ঈশ্বরের

আদেশ প্রতিপালনে আর বিলম্বের আবশ্যকতা নাই। এখনই মঙ্গলময়ের নাম স্মরণ পূর্ব্বক যাত্রা কর।” তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রবোধ সত্যানন্দ প্রভৃতি ঋষিগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক দেশভ্রমণে বহির্গত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরিধানে গৈরিকবসন, স্কন্ধে গৈরিক উত্তরীয়, দক্ষিণ হস্তে একতারা, বাম হস্তে কমণ্ডলু এবং পৃষ্ঠে অজিনাসনে সজ্জিত হইয়া সাধক প্রবোধচন্দ্র আনন্দ-আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। আশ্রমস্থ নরনারী সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর আসিয়া অগ্রসর করিয়া দিলেন। শেষবিদায়কালে বৃদ্ধ যোগানন্দ মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, “বৎস প্রবোধ! সিদ্ধিদাতা শ্রীহরি তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ করুন।” সত্যানন্দ প্রবোধকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন, “ভাই প্রবোধ! তুমি যেমন শীঘ্র শীঘ্র হরিপাদপদ্ম লাভ করিলে, এমন অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমি ধন্য হইলাম। প্রার্থনা করি, মঙ্গলময় দেবতার আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক অচিরাৎ তুমি এখানে প্রত্যাবর্ত্তন কর।” একে একে অন্যান্য সকলেই তাঁহাকে বিদায় দিয়া আশ্রমে ফিরিলেন। এবং তিনি “হরের্নামৈব-কেবলম্” সুর করিয়া গাহিতে গাহিতে নবদ্বীপাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তপোবনের একটী উজ্জ্বল অলঙ্কার স্থানচ্যুত হওয়ায় যেন সমুদায় বনপ্রদেশ অন্ধকারে আবৃত হইল। এবং কয়েক দিন পর্য্যন্ত আনন্দ-আশ্রম যেন নিরানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া রহিল। মায়াপরি-

শূন্য বৈরাগী বৃদ্ধযোগী যোগানন্দেরও প্রাণে যেন কেমন একটু বিষাদের ছায়া পড়িল। তপোবনে সেই ফুল ফুটিত, সেই কোকিল ডাকিত এবং সেই বায়ু বহিত, তথাপি প্রবোধের বিরহে যেন ফুলের মুখে আর তত হাসি ছিল না, কোকিলের স্বরে আর তেমন মিষ্টতা ছিল না এবং বায়ুর হিল্লোলে আর তেমন প্রাণবিমুগ্ধকারিণী স্নিগ্ধতা ছিল না। একদিন সত্যানন্দ একতারা বাজাইয়া গান করিলেন—

"সে ফুল ফোটে না, সে পাখী গায় না,
সে চাঁদ হাসে না, সে রূপে আর।"

তাঁহার গানের সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় তপোবন যেন গাহিয়া উঠিল—

"আনন্দ-কানন, করিছে রোদন,
দেখ তপোবন, এবে অন্ধকার।
(হরিপ্রেমে পাগল প্রবোধ বিনা)"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দেশভ্রমণ।

সচরাচর প্রায় সকলেই বলিয়া থাকেন, আমরা সংসার-চিন্তায় অহর্নিশি ব্যতিব্যস্ত। আমাদের মন এক নিমিষের জন্যও স্থির নহে, সুতরাং আমরা ঈশ্বরচিন্তা করিব কিরূপে? অন্নবস্ত্রের চিন্তা থাকিতে ব্রহ্মচিন্তা কখনই হয় না। যাঁহারা সংসারবিরাগী ফকির, তাঁহারাই হরি-নাম করিতে পারেন, আমাদের মত সংসারিক জীবের পক্ষে উহা বিড়ম্বনামাত্র। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা জানেন না যে, শ্রীহরি ফকির ও সংসারী সকলকেই এক চক্ষে দর্শন করেন। তিনি ফকিরের নিকটেও যেমন আত্মপ্রকাশ করেন, সংসারীর সমীপেও তেমনই সমুপস্থিত হয়েন। ফকির এবং সংসারী এ দুই স্বতন্ত্র জীব নহে। ফকিরও যে সংসারীও সে। যাঁহার প্রাণ এই চিরসৌন্দর্য্য-শীল বিশ্ব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ইহার স্রষ্টার চরণে স্বতঃই অবনত হইয়া পড়ে এবং যিনি সেই সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া অসার সাংসারিক চিন্তা হইতে স্বতঃই দূরে অবস্থান করেন, তিনিই বৈরাগী, চাই তিনি সংসারেই থাকুন আর ফকিরী লইয়া পথে পথেই ভ্রমণ করুন। এই সাধারণ সূত্র ধরিয়া অনেক গৃহী সংসারে থাকিয়াও বৈরাগী এবং অনেক ফকির পথে পথে ঘুরিয়াও ঘোর সংসারী। মূল কথা, যাঁহার প্রাণ বিশ্বরূপী হরির রূপে প্রলুব্ধ নহে, তিনিই সংসারী। যিনি জন্মাবধি আপন গৃহ-প্রাঙ্গণের

বাহিরে পদার্পণ করেন নাই, যিনি আপন গৃহ, গ্রাম ও নগরকেই ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বুঝেন এবং যিনি বিদ্যালয়ে পঠদ্দশায় মানচিত্রে সাগর, মহাসাগর, গিরি, উপত্যকা, কানন ও মরুভূমি প্রভৃতি দেখিয়াই সন্তুষ্ট, তিনি কখনই বুঝিতে পারেন না যে, পরমেশ্বরের অলৌকিক বিশ্বচরণা কি চমৎকার ব্যাপার! সুতরাং তাঁহার নীরস মনও কিছুতেই হরিনামে বিগলিত হইতে চায় না। যিনি যাহাকে ভালবাসেন না, তিনি তাহার নামে গলিবেন কেন? আমার যাহার প্রতি অনুরাগ আছে, তুমি তাহার নাম করিতে না করিতেই আমার প্রাণটা চমকিয়া উঠিবে। সেইরূপ, যিনি চিরসুন্দর শ্রীহরিকে ভালবাসেন, হরিনামে তাঁহারই প্রাণ দ্রবীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু হরির প্রতি ভালবাসা কি সহজ? মানুষ ভালবাসে কাহাকে? যাহার রূপ অথবা গুণ আছে। গোলাপের রূপ আছে, তাই মানুষ গোলাপকে ভালবাসে এবং কোকিলের গুণ আছে, তাই মানুষ কোকিলকে ভালবাসে। হরির কি আছে যে হরিকে ভালবাসিব? হরির রূপ এবং গুণ দুইই আছে। তুমি গোলাপের রূপ দেখিলে, কিন্তু গোলাপকে যিনি রূপ দান করিলেন, তাঁহাকে দেখিলেনা কেন? তুমি কোকিলের গুণ বুঝিলে, কিন্তু কোকিলকে যিনি গুণবিশিষ্ট করিলেন, তাঁহাকে বুঝিলে না কেন? যদি তাঁহাকে দেখিতে এবং বুঝিতে, তাহা হইলে গোলাপ এবং কোকিল ছাড়িয়া তুমি তাঁহাকে লইয়াই রাত্রিদিন পড়িয়া থাকিতে। হরির রূপ এবং গুণ দেখা ও জানা যায় কিরূপে? যদি তুমি এই সুন্দর বিশ্ব-

সংসারের, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, নদীর তটে তটে, মহাসাগরের বক্ষে বক্ষে, কিছুকাল ভ্রমণ পূর্ব্বক মহেশের মহাকার্য্য দর্শন করিয়া বৈড়াইতে পার, তাহা হইলেই তুমি শ্রীহরির যে কত রূপ তাহা দেখিতে পাইবে। এবং যদি তুমি রোগে, শোকে, অনাহারে, ঘোর বিপদে ও মৃত্যুমুখে সরল অন্তরে তাঁহার চরণতলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িতে পার, তাহা হইলেই তুমি তাঁহার যে কত গুণ তাহা জানিতে পারিবে। সাধকেরা প্রায়ই বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া আপনাদিগের সাধনাকে বর্দ্ধিত ও স্থায়ী করেন। দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিলে যাহা না হয়, একবার দেশভ্রমণ করিয়া আসিলে অনায়াসেই তাহা হইয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রামে গ্রামে, কাননে কাননে, নীলাচলে ও গঙ্গাযমুনাপুলিনে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতেন। এইজন্যই ঈশা ও মহম্মদাদি সাধুগণও সর্ব্বদাই পাহাড়ে বাস করিতেন। এইজন্যই পূর্ব্বতন ঋষিমুনিগণ তপোবনাদিতেই চিরজীবন অতিবাহিত করিতেন। এবং এইজন্যই বর্ত্তমান সময়ে সভ্যজাতিদিগের মধ্যে অনেকেই দেশভ্রমণ এবং কেহ কেহ সমুদায় পৃথিবী পর্য্যন্তও পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

জমিদার ভবনে।

প্রবোধচন্দ্র শ্রীহরির আদেশে প্রাতঃকালেই আনন্দআশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছেন। গঙ্গার ধারে ধারে

উত্তর মুখে চলিয়াছেন। কোথায় যাইবেন কি করিবেন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। কেবল দেশভ্রমণ পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের মহিমা দর্শন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। দ্বিবা দ্বিপ্রহরের সময় জমিদার রাজীবলোচনের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহার একজন কর্ম্মচারী সাদরে প্রবোধচন্দ্রকে তাঁহার গৃহে আনয়ন করিলেন। জমিদার মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই সত্যানন্দের নিকটে প্রবোধচন্দ্রের সমুদায় সংবাদই অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে নিজ ভবনে পাইয়া বিশেষ সুখী হইলেন। ভোজনান্তে প্রবোধচন্দ্র উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রাজীবলোচন আসিয়া বলিলেন, "প্রবোধচন্দ্র! আমি তোমার পিতার নিকটে বিশেষ পরিচিত, এবং তিনি আমার একজন প্রিয় বন্ধু। যদিও তুমি আমাকে জান না, কিন্তু বাল্যকাল অবধি আমি তোমাকে অনেকবার দেখিয়াছি। তোমার কুচরিত্রের জন্য তোমার পিতা আমার নিকটে কতবার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পতিতপাবন দেবতার আশীর্ব্বাদে তোমার সমুদায় কুপ্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। সন্ন্যাসী সত্যানন্দের মুখে ইতিপূর্ব্বেই তোমার কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। আজ তোমাকে আপন গৃহে পাইয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম। আমার গৃহকে তোমার পিতৃগৃহ মনে করিয়া যত দিন ইচ্ছা এখানে বাস কর; তোমার কোন বিষয়ে কিছুই অসুবিধা হইবে না।"

প্রবোধচন্দ্রের মনে পড়িল একবার রাজীবলোচনের

কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের কথা হইয়াছিল, কিন্তু কোন কারণে বিবাহ হয় নাই। মনে হইবামাত্রই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। রাজীবলোচনের কথার উত্তর দিয়া বলিলেন, "মহাশয়! বড় সৌভাগ্য যে আজ আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিলাম। আমার পিতা যখন আপনার বন্ধু, তখন আপনিও আমার পিতৃতুল্য তাহাতে সন্দেহ নাই আপনি স্নেহ-পরবশ হইয়া আমাকে এখানে রাখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু এ বেশে আমি আপনার এখানে একদিনও অবস্থিতি করিতে পারি না। কেননা, আমি এখন সন্ন্যাসী, দেশভ্রমণ করাই আমার কার্য্য। অতএব অনুমতি করুন, আমি এখনই বিদায় গ্রহণ করি।"

রাজীবলোচন ইহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "প্রবোধ! তোমার সাধনা যথেষ্ট হইয়াছে। সাংসারিক মানবের পক্ষে ইহার অধিক আর কিছুরই আবশ্যকতা নাই। এখন তুমি দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহে বসিয়াই হরিনাম কর, দেশ-ভ্রমণের আর প্রয়োজন নাই।" প্রবোধ সুমিষ্টস্বরে বিনয়-পূর্ণ বচনে কহিলেন, "তাত! আমি আপনার স্নেহ সন্দর্শনে বিশেষ বাধিত হইলাম। কিন্তু শ্রীহরি স্বয়ং আমাকে দেশভ্রমণের আদেশ করিয়াছেন। আমি প্রাণ থাকিতে তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না।" রাজীব-লোচন বলিলেন, "তোমার পিতা ইতিপূর্ব্বেই আমার একমাত্র পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তোমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন; এবং আমিও তোমার সাধুতা

দেখিয়া মনে করিয়াছি, আমার সমুদায় বিষয় বিভব অট্টালিকা প্রভৃতি তোমাকে দান করিয়া তোমাকেই পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিব। যদিও আমি অপুত্রক, কিন্তু তোমাকে পাইলে আমার আর সে দুঃখ থাকিবে না। তুমি তপোবনে যোগ শিক্ষা করিতেছ বলিয়া এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তোমার সে শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং অদ্য তোমাকে গৃহে পাইয়া আবার দেশভ্রমণের জন্য আমি কখনই ছাড়িয়া দিতে পারিব না। আজ যদি আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে তুমি যে কোথায় যাইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে তুমি প্রাণে বিনষ্ট হইতেও পার। তুমি তোমার পিতামাতার একমাত্র পুত্র, তোমার কোন অমঙ্গল ঘটিলে তাঁহাদের দশা কি হইবে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি।"

প্রবোধচন্দ্র উত্তর দিলেন, "আপনি অন্যায় আশঙ্কা করিতেছেন। আপনি কি জানেন না, যাহারা হরিপাদপদ্মে স্থান প্রাপ্ত হয়, এ জগতে তাহাদের কোন বিপদ নাই। বিপদভঞ্জনের নামে সমুদায় বিপদে আমি উদ্ধার লাভ করিব। আপনি আমাকে প্রসন্ন মনে বিদায় দিউন। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।" এই কথা বলিয়া প্রবোধ রাজীবলোচনের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। রাজীবলোচন আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! দেবতা তোমার মঙ্গল করুন। তোমাকে দেশভ্রমণের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন ও দারপরিগ্রহ

করিতে হইবে। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেই যে ধর্ম্ম হয় তাহা নহে; গৃহস্থাশ্রমেই পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন হইয়া থাকে। অতএব আমি তোমাকে কিছুতেই বিদায় দিতে পারি না।” প্রবোধচন্দ্র বিষম বিপদে পড়িলেন। “একি হরি! আবার এ কি বিষম গোলযোগে পড়িলাম? কোথায় নিশ্চিন্ত মনে দেশে দেশে তোমার মহিমা দর্শন করিয়া বেড়াইব, না প্রলোভনের রজ্জুতে হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক কারাগারে নিক্ষেপ করিলে। সুন্দরী স্ত্রী, ধনরত্ন, বিষয় অট্টালিকা লইয়া কি করিব ঠাকুর? ও সকলে ত কিছুই আনন্দ পাইব না। আমি যে কেবল তোমার চরণ ধূলিরই ভিখারী। সে চরণ-ধূলি হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবে না কি? না প্রভো! তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। সে রত্ন হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। আমি তোমার পায় পড়ি, আমাকে আর বিষয়-কূপে নিমগ্ন করিও না।” এই বলিয়া ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাজীবলোচনের পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “তাত! আপনার পায় পড়ি, আমাকে আর যন্ত্রণা দিবেন না। ধন রত্ন বিষয় অট্টালিকায় আমার বিন্দুমাত্রও স্পৃহা নাই। আমি এখন হরিধনের কাঙ্গাল। আপনি আমাকে হরিধন ভিক্ষা প্রদান করুন। মঙ্গলময় আপনার মঙ্গল করিবেন।” তাঁহার আকারপ্রকার দর্শনে ও কাতরোক্তি শ্রবণে রাজীব-লোচনের প্রাণ বিগলিত হইল। কে যেন তাঁহার প্রাণের ভিতরে বলিয়া দিল যে, প্রবোধকে আর বাধা দেওয়া উচিত নহে। তখন তিনি বলিলেন, “বৎস প্রবোধ!

তোমার ঐকান্তিকতা দর্শনে আমার মন মুগ্ধ হইয়াছে। তোমাকে বাধা দিবার আর আমার প্রবৃত্তি নাই। অনুমতি করিতেছি, তোমার অভীষ্ট কার্য্যে গমন কর।” অনুমতি পাইবামাত্রই প্রবোধচন্দ্র “হরিবোল” বলিতে বলিতে তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। রাজীবলোচন প্রভৃতি সকলে ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শান্তিপুরে।

গঙ্গাতীরে আসিয়া প্রবোধ ভূমে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, “প্রভো! পুণ্যময়! এ তোমার কি খেলা? দাসকে যাতনা দিয়া আশ্রিত জনকে কাঁদাইয়া তোমার আনন্দ হয় নাকি? আমি তোমাকে চাই, কি বিষয় বিভব স্ত্রী পুত্র চাই, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই কি এই কাণ্ড করিলে? তোমার মনের ভাব তুমিই জান। যাহাতে তোমার তৃপ্তি হয়, এ দাসকে লইয়া তাহাই কর, আমার তাহাতে কিছুমাত্রও দুঃখ নাই। তোমার যাহাতে আনন্দ আমারও তাহাতেই আনন্দ। তোমার আনন্দের জন্যই আমার জীবন ধারণ করা।” এই বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শান্তিপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে প্রবোধচন্দ্র শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বগগণের অন্ধকারের ছায়া পড়িয়া গঙ্গার জলকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছে। আকাশের স্থির নক্ষত্রালোক সেই কৃষ্ণবর্ণ জলে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একটী তরঙ্গ আসিয়া

জলের সঙ্গে সেই সুস্থির তারকাবলীকেও কাঁপাইয়া তুলিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া তীরস্থ তরুলতা সন্ধ্যাসমীরে এক একবার কম্পিত হইতেছে। পথশ্রান্ত প্রবোধ ক্লান্ত কলেবরে প্রশান্ত পুলিনে বসিয়া একতারা বাজাইলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণের তারও বাজিয়া উঠিল। এমন সময়ে গভীর জলরাশি অগণ্য তারকামালার সহিত একবার কাঁপিয়া উঠিলে মনে হইল, যেন তাঁহার বীণাঝঙ্কারে বিমানবিহারিণী চন্দ্রসোহাগিনী নক্ষত্ররূপিনী সুরকন্যাগণ আলোকমালা হস্তে লইয়া নাচিয়া নাচিয়া তাঁহারই আরতি করিতেছে, যাঁহার অনুপম হস্তসংস্পর্শে এই প্রকাশমান সায়ন্তন শ্রীর অপার মাধুর্য্যে দশদিক বিমোহিত হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্র গাহিলেন, "গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে, গাহিছে অনন্ত স্বরে, গায় রবি চন্দ্র তারা জয় ব্রহ্ম জয়।" আকাশ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত আর একবার তাঁহার সঙ্গে গাহিয়া উঠিল, "অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে, গাহিছে অনন্ত স্বরে, গায় রবি চন্দ্র তারা জয় ব্রহ্ম জয়।" অনেকক্ষণ পরে গান সমাপ্ত করিয়া প্রবোধচন্দ্র ভাবিলেন, ক্ষুদা রাত্রির জন্য একবার গৃহে গমন করিলে হয়। পরক্ষণেই মনে পড়িল, মহর্ষি এই দেশভ্রমণ রূপ সাধনের সময় গৃহে গমন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং গৃহে না গিয়া নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষমূলে রজনী যাপন করিবার জন্য শয়ন করিলেন। সমস্ত দিন পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, সুতরাং অনতিবিলম্বেই গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি যখন দ্বিপ্রহরাতীতপ্রায় তখন প্রবোধ চমকিয়া জাগরিত হইলেন। আচম্বিতে এক রমণীকণ্ঠোচ্চারিত হৃদয়বিদারক ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তাঁহার মাতা কমলিনী যেন এই গভীরা রজনীতে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন। অমনই প্রবোধ একতন্ত্রী ও আসন ফেলিয়া নিজ ভবনাভিমুখে ছুটিলেন। তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ হইতে বিবেক ও বৈরাগ্য হাততালি দিয়া বলিলেন, "প্রবোধ! প্রবোধ! পরাস্ত হইলে।" প্রবোধচন্দ্র নির্ব্বাক্ হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। বিবেক তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ পুরঃসর কহিলেন, "প্রবোধ! এখনও অসার মায়ামোহকে তুমি পরিত্যাগ করিতে পার নাই। শ্মশানে একজন পতি-হারা রমণী ক্রন্দন করিতেছে, তুমি তোমার জননীবোধে গৃহাভিমুখে ছুটিতেছিলে। যদিই বা তোমার জননী হয়েন, তাহা হইলেই বা তোমার এত মায়া কেন? তুমি ত এখন গৃহী নহ; তুমি যে এখন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর মনে অনিত্য মায়ার বন্ধন, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।" প্রবোধচন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "দেব! কি জানি প্রাণটা কেমন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। মনে হইতেছে, আমারই যেন পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে। সংসারটাকে অসার বলিয়া বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। ভবের মেলায় দুদিনের জন্য আসিয়াও অনেক সময় নিত্যকালের জন্য বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, এখন উপায় বলুন, কিরূপে মায়ারাক্ষসীর হস্ত-হইতে পরিত্রাণ পাই।"

বিবেক ও বৈরাগ্য "আমাদের সঙ্গে আইস" বলিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রবোধকে শ্মশানক্ষেত্রে লইয়া আসিলেন। শ্মশানের ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। উহার একদিকে শিবাদল ভৈরব রব করিতেছে এবং অন্যদিকে কুক্কুরগণ কঠোর চীৎকার করিতেছে। নিম্নে কলনাদিনী জাহ্নবীর তরঙ্গ তটভূমিতে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া ছপ্ ছপ্ শব্দে শ্মশানের ভয়াবহতা আরও বৃদ্ধি করিতেছে। নরাস্থি ও নরকপাল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া সংসারের অনিত্যতা প্রদর্শন করিতেছে। সম্মুখেই একটা পত্রবিহীন বৃক্ষ ভূতের মত শূন্যদেশে হাত পা মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে প্রবোধ জাগরিত হইয়াছিলেন, ক্রমে সে ক্রন্দনরব শ্মশান হইতে নগরাভিমুখে যাইতে লাগিল; অন্ধকারে কাহাকেও কিন্তু দেখিতে পাওয়া গেল না। একটা চিতাভস্মরাশি হইতে অল্প অল্প ধূমোদ্গম হইতেছে দেখিয়া বোধ হইল, অতি অল্প সময় পূর্ব্বেই তাহা নির্ব্বাণ হইয়াছে। বৈরাগ্য প্রবোধচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! এই ভীষণ শ্মশানভূমি পরিদর্শন করিলে মানবের মন হইতে অসার মায়ামোহ আপনিই পলায়ন করে। নগরের বিলাসাভিমানে, সভ্যতার আড়ম্বরপূর্ণ কোলাহলে এবং বাসনার প্রবল বিষয়াসক্তির মধ্যে মানব আপনার অসারতা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। কিন্তু এই শ্মশানক্ষেত্রে একবার আসিলে দেখা যায়, কি বিদ্বান কি মূর্খ, কি সবল কি দুর্ব্বল, কি ক্ষুদ্র কি

মহান্, কি রাজা কি ভিখারী, সকলেই আপন আপন অভিমান ভুলিয়া এক বেশে এক শয্যায় শয়ন করিয়া দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এখানে আসিলে ঘোর বিষয়ীর প্রাণেও একটু বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। এখানে আসিলে বীরের বীরত্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় এবং ধনীর সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। যাহারা স্ত্রী-পুত্রাদি বিষয়বিভবকে সার বলিয়া বুঝিয়াছে এবং দেহকেই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া তাহার যত্নেই মজিয়াছে, তাহারা এই শ্মশান দর্শনে অতিমাত্র ভীত ও কম্পিত হইয়া থাকে। আর যাঁহারা সমুদায় সংসারকে অনিত্য ও অসার জানিয়া এক-মাত্র স্বর্গধামকেই নিত্য ও সার বলিয়া বুঝিয়াছেন, এবং মৃত্যুকে সেই স্বর্গনিকেতনে যাইবার সোপানমাত্র বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারা এই শ্মশান দর্শনে প্রাণে বিমল শান্তিসুখ লাভ করেন। সেইজন্যই কবি লিখিয়াছেন, "মূর্খানাং ভীষণং ভীমং বুধানাং শান্তিভাবনম্। শোকদুঃখ-সুখাদীনাং সর্ব্বেষামন্তকারণম্।" অর্থাৎ মূর্খদিগের নিকটেই শ্মশান ভীষণ স্থান, কিন্তু জ্ঞানীগণের নিকটে ইহা শোক, দুঃখ ও সুখাদির অন্তকারী শান্তিভবন বিনা আর কিছুই নহে। এইজন্যই মহাযোগী পরমজ্ঞানী ব্রহ্মপরায়ণ মহাদেব রাত্রিদিন শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করিতেন এবং নরাস্থি ও নৃমুণ্ডাদির মালা ধারণ করিতেন। অতএব প্রবোধ! এই শ্মশানে বসিয়া জলন্ত বৈরাগ্য শিক্ষা কর। ধন জন যৌবনের পরিণতি কোথায়, তাহা একবার প্রত্যক্ষ দর্শন কর। প্রত্যক্ষ দর্শন বিনা প্রকৃত জ্ঞানলাভ কখনই

হয় না। অতএব অদ্য সমস্ত রাত্রি এই শ্মশান-প্রাঙ্গণে বসিয়া সাধন কর।" এই কথা বলিয়া বিবেক ও বৈরাগ্য অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। প্রবোধচন্দ্র নিকটবর্ত্তী একটী চিতাভস্মস্তূপের উপরে আসন পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক একতারা বাজাইয়া গাহিলেন, "ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়, কেহ কারও নয়; মিছে আমার আমার আমার বল, আমার কে তা চিন্‌লে না।"

কিয়ৎকাল পরে আবার একটী হৃদয়বিদারক ক্রন্দন-ধ্বনি প্রবোধের শ্রুতিগোচর হইল। তিনি গান বন্ধ করিয়া দেখিলেন, একটী দুঃখিনী বিধবা তাঁহার এক মৃত পুত্রকে বক্ষে লইয়া তথায় চীৎকার করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাকে কত নিবারণ করিতেছে, তথাপি তিনি কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছেন না। প্রবোধের মনে হইল, যেন তিনি সেই স্ত্রীলোকটীকে চিনেন এবং তাঁহার মৃত পুত্রটীকেও অনেকবার দেখিয়াছেন। পুত্রটীর বয়ঃক্রম নয় কি দশ বৎসর, দেখিতে পরম সুন্দর, তাহার সৌন্দর্য্যে দর্শকমাত্রেই মোহিত হইত। প্রবোধচন্দ্র ভাবিলেন, আহা! অভাগিনী জননীর এখন উপায় কি হইবে? কাহার মুখপানে চাহিয়া তিনি অসার জীবনভার বহন করিবেন? এ সংসার যে তাঁহার নিকটে মরুভূমি হইয়া গেল। বোধ হয়, এই পুত্রশোকে বিধবা জননী নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। এমন সময়ে শববাহকগণ চিতা সজ্জিত করিয়া সেই মৃত বালককে তাহার উপর শয়ন করাইল। তদ্দর্শনে মাতা শ্মশান-শয্যায় লুণ্ঠিতা হইয়া

ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রবোধের প্রাণটীও যেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। একজন হস্তে অগ্নি লইয়া সাত বার চিতা প্রদক্ষিণ করতঃ যেমন বালকের মুখে অগ্নি-সংযোগ করিতে গেল, হায় হায়! অভাগিনী জননী অমনই মূর্চ্ছিতা হইলেন—প্রবোধচন্দ্রও দুই হস্তে দুই চক্ষু আবৃত করিয়া হঠাৎ সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। অনেক-ক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন, তিন জন সঙ্গী মূর্চ্ছিতা জননীর শুশ্রূষা করিতেছে এবং এক জন সেই চিতাশয্যায় অগ্নি প্রয়োগ করিতেছে। ক্ষণকাল পরে দুই জনে ধরাধরি করিয়া মাতাকে তথা হইতে অন্যত্র কোথায় লইয়া গেল, এবং আর দুই জনে চিতানলকে প্রজ্জলিত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চিতা জ্বলিল—অভাগিনী জননীর জীবনসর্ব্বস্বকে গ্রাস করিয়া জ্বলিল। প্রবোধচন্দ্র একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া স্থিরনেত্রে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে অগ্নি বালকের গাত্র স্পর্শ করিল, পুড়িতে পুড়িতে সোণার বর্ণে কালি ঢালিয়া দিল। প্রবোধচন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ও কি হইল! অত রূপ কোথায় গেল? অগ্নি! একটু স্থির হও, আর পোড়াইও না।" অগ্নি শুনিল না; সে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে গড়াইতে গড়াইতে হাসিতে হাসিতে বালকের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। বালক যেন সেই হাসিতে হাসি মিশাইয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। প্রবোধচন্দ্র আবার বলিয়া উঠিলেন, "ও কি? মুখখানিও পুড়িয়া যাইবে না কি? অগ্নি! ও অগ্নি! শোন, তোমার

পায় পড়ি, ও মুখখানি—অত সুন্দর মুখখানি পুড়াইও না।” সে কথা কে শোনে? সর্ব্বসংহারক অগ্নির যাহা কার্য্য, সে তাহাই করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে বালকের সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গই দগ্ধ হইয়া গেল। প্রবোধের চক্ষে পলক নাই, অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন, তাঁহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, সুখদুঃখ বোধ করিবার শক্তি পর্য্যন্তও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি পাগলের মত একবার সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকান, আরবার আকাশের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—প্রগাঢ় অন্ধকার। প্রাণে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। আবার চিতার দিকে চাহিলেন। ক্রমে অগ্নিশিখা নিবিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে সোণার পুতলি দুধের গোপাল বালককে পোড়াইয়া নির্দ্দয় অগ্নি নিবিয়া গেল। চিতার আলোক চতুর্দ্দিকের অন্ধকারের কোণে কোথায় মিশাইয়া গেল। শববাহীগণ হঠাৎ উচ্চ-রবে “হরিবোল” বলিয়া উঠিল; সেই শব্দে প্রবোধের হস্ত হইতে একতারা খসিয়া পড়িল। তিনি চাহিয়া দেখি-লেন, পূর্ব্বাকাশে উষার আলোকচ্ছটা অল্প অল্প প্রকা-শিত হইতেছে। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্ধলোকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, “অসারের অসার সকলই অসার!” আকাশ হইতে দুই জন দেবশিশু যেন বলিয়া উঠিলেন, “শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।”

প্রবোধের প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়াছে, কিছুই আর তাঁহার কাছে ভাল লাগিতেছে না। তিনি সংসারটাকে

নিতান্তই অসার বলিয়া বুঝিয়াছেন। মনে করিলেন, আর সংসারে আসক্ত হইবেন না। চিরজীবন এইরূপে পথে পথে উদাসীনবেশে পরমেশ্বরের মহিমা দর্শন করিয়াই ভ্রমণ করিবেন। প্রভাতেই তিনি শান্তিপুর ছাড়িয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নদীগর্ভে।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

বহুদিন অতীত হইয়া গেল, প্রবোধের আর কোন সংবাদই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মধ্যে এক জন বৈষ্ণব আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি নবদ্বীপে সন্ন্যাসী প্রবোধচন্দ্রকে দেখিয়া আসিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্র যখন প্রথমে নবদ্বীপধামে প্রবেশ করেন, তখন সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝি তেমনই করিয়া আর একবার নবীন সন্ন্যাসীবেশে তাঁহার প্রিয় নবদ্বীপভূমিকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী কাঙ্গাল, সাধু পাপী সকলেই এই নবযোগীকে দর্শন করিবার আশয় আর একবার তেমনই করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়াছিলেন। বোধ হয়, শচীমাতা জীবিতা থাকিলে, তিনিও "প্রাণের নিমাই এলি না কি" বলিয়া ছুটিয়া আসিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও বোধ হয় মূর্চ্ছিতা হইয়া ধূলায় অবলুণ্ঠিতা হইতেন। সত্য সত্যই, কতকগুলি বৈষ্ণব প্রবোধচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ

কয়েক দিন ঘুরিয়াছিলেন। তাঁহারা যতবারই আমাদের প্রবোধের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, ততবারই যেন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। গ্রাম্য বালকেরা যখন উন্মত্ত প্রবোধের পশ্চাতে পশ্চাতে "হরিবোল" বলিতে বলিতে দল বাঁধিয়া চলিয়াছিল, এবং সেই "হরিবোল" শব্দে প্রবোধ যখন নাচিতে নাচিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া ধূলায় পড়িতেছিলেন, তখন সত্য সত্যই কয়েক জন বৈষ্ণব বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "দেখ দেখ! আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখ!" আবার যখন প্রবোধচন্দ্র সম্মুখস্থিত একজন বৈষ্ণবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! শ্রীবাসের অঙ্গন কোথায় ছিল জানেন?" তখন সেই বৈষ্ণবটী কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে বলিলেন, "প্রভো! আপনার অগোচরে কি আছে? আজ আপনাকে দর্শন করিয়া আমার মানবজন্ম সফল হইল।" এই বলিয়াই তিনি প্রবোধচন্দ্রের পদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন এবং প্রবোধচন্দ্রও তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া ধূলায় লুটাইতে লুটাইতে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রবোধ বলিলেন, "ভাই! হরিবোল বল।" বৈষ্ণবগণ বলিলেন, "প্রভো! হরিবোল বলুন।" এক জন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবোধকে দেখিয়া সাশ্চর্য্যে বলিলেন, "এ কি! শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ যেন এই সন্ন্যাসীটীর মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে!" প্রবোধচন্দ্র দিশাহারা পথিকের মত শ্রীবাসের অঙ্গনভূমি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার কোনই সন্ধান পাইলেন না। ইহার পরে তিনি যে

কোথায় গেলেন, সে কথা আর কেহই বলিতে পারিল না।

অনেক দিন পরে দেখা গেল, নেপালের দক্ষিণস্থ গণ্ডক নদীর তীরে এক বৃক্ষমূলে সন্ন্যাসী প্রবোধ উপবিষ্ট আছেন। সম্মুখে এক বৈষ্ণব বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! সাধুসঙ্গ না পাইলে কি জীবের পরিত্রাণ কিছুতেই হয় না?" প্রবোধচন্দ্র উত্তর দিলেন, "নিরাকার শ্রীহরি শূন্যে শূন্যে প্রকাশিত হয়েন না; সাধুর হৃদয়াধারেই তাঁহার প্রকাশ দর্শন করা যায়। সেইজন্যই জগতে সাধুভক্তের এত আদর। সাধুকে দেখিলে সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকেও দেখা যায়; সেইকারণেই সাধুদর্শন জীবের বহু পুণ্যফল বলিয়া লোকে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সাধুর আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কেহ কখনই ভগবানকে দেখিতে পায় না, সুতরাং তাহার মুক্তিও হয় না।" বৈষ্ণব বলিলেন, "প্রভো! অনেক পুণ্যফলে আমি আপনার সঙ্গ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আদেশ করুন, কোন্ কোন্ সাধন অবলম্বন করিতে হইবে।" প্রবোধচন্দ্র উত্তর দিলেন, "কাহার পক্ষে কিরূপ সাধনের প্রয়োজন, তাহা উপদেষ্টাগণ জানেন না। সাধক নিজে আপনার অবস্থা বুঝিয়া বিশেষ বিশেষ সাধন প্রণালী অবলম্বন করেন। তবে বহুকাল একত্রে বাস করিলে আচার্য্য, কোন কোন বিষয়ে উপদেশ-প্রার্থীর মনের ভাব অবগত হইয়া, তদুপযোগী সাধন-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তুমি অতি অল্প দিনই আমার সঙ্গে রহিয়াছ, সুতরাং আমি এখনও তোমার মনের

অবস্থা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত নহি। অতএব তোমার মনের অবস্থা তুমি নিজেই বুঝিয়া সময়োপযোগী সাধন গ্রহণ কর।” বৈষ্ণব উত্তর দিলেন, “মহাশয়! আমি অতি জ্ঞানহীন মূঢ়, নিজের ভালমন্দ কিছুই নিজে বুঝিতে পারি না। আপনি যতদূর আমার মনের ভাব অবগত হইয়াছেন, তাহারই মত কিছু সাধন করিতে উপদেশ দান করুন।” তখন প্রবোধচন্দ্র বলিলেন, “তুমি সাধু! কেন না, তুমি আপনাকে অজ্ঞান বলিয়া বুঝিয়াছ। অনেকে আচার্য্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে যায় বটে, কিন্তু আপনাকে মহাজ্ঞানী বলিয়া মনে করে। এমন কি, সময়ে সময়ে উপদেষ্টার সঙ্গে ঘোরতর অনর্থক তর্ক যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, তাহারা কিছুই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। তুমি যখন আপনাকে মূর্খ বলিয়া বুঝিয়াছ, তখন তোমার আর কোনই ভয় নাই। প্রাণপণে নাম সাধন কর, নামের গুণে তুমি মুক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে ”

দেখিতে দেখিতে দিবাভাগ অবসান হইয়া আসিল। হঠাৎ আকাশে একখানি মেঘ উঠিয়া বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। প্রবোধচন্দ্র ও সেই বৈষ্ণবটী বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বৃষ্টিধারা হইতে কোনও রূপে আপনাদিগকে রক্ষা করিলেন। সন্ন্যাসীর গাছতলা ভিন্ন আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায় বল? ঐ যে গগণস্পর্শী প্রকাণ্ড সুধাধবলিত প্রাসাদ দেখিতেছ, যাহার শতদিকে শত শত বিজয়বৈজয়ন্তী সমীরণভরে ক্রীড়া করিতেছে,

এবং যাহার চারিদিকে নির্ম্মুক্তকৃপাণহস্ত প্রহরীগণ সদর্পে ধীরে ধীরে পদ সঞ্চালন করিতেছে, ওখানে নররুধির-লোলুপ নৃশংস নররাক্ষস বিনা আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। ঐ যে চাকচিক্যশালী মনোহর সৌধমালা দেখিতেছ, ওখানে স্বার্থপর বিষয়ী ভিন্ন আর কাহারও সমাদর নাই। কেবলমাত্র বৃক্ষমূলই সাধু শান্ত জ্ঞানীদিগের মস্তক রাখিবার স্থান। সেইজন্যই ঈশ্বরের সুপুত্র ঈশা বলিয়াছিলেন, "শৃগাল সকলেরও গর্ত্ত আছে এবং আকাশস্থ পক্ষিগণেরও কুলায় আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের (অর্থাৎ ঈশার) মস্তক রাখিবার একটুও স্থান নাই। সত্যসত্যই, জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই মনুষ্য-কুলের পরিত্রাণের সমাচার-বাহক নবযোগী খ্রীষ্টকে পথে পথে বনে বনে গাছের তলায় তলায় ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। শৃগাল কুক্কুরেরও আদর ছিল, কিন্তু তাঁহার একবিন্দুও আদর ছিল না। সুনীতি-তনয় রাজকুমার হইয়াও একটীবারের জন্যও রাজ-সিংহাসনে পিতৃক্রোড়ে উঠিতে না পাইয়া অরণ্যে অরণ্যে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন। যাঁহারা জগতে সাধুভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জগতকে কোন্ নূতন সত্য দিবার জন্য আগমন করেন, যাঁহারা পরসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আত্মোদর পরিপূরণের অভিলাষ করেন না, যাঁহারা হিংসাবিদ্বেষশূন্য হইয়া প্রেমে ও শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকেই অগ্রে বৃক্ষতল সার করিতে হয়। সংসার কখনই সাধুভক্তদিগকে প্রথমে চিনিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাদিগকে আদরও করে

না। অন্নবস্ত্রের অভাবে এবং মস্তক রাখিবার স্থানের অভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী উপাসকগণকে সময়ে সময়ে যে কষ্টে পড়িতে হয়, তাহা দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। আমি জানি, আমার পরিচিত একজন ঈশ্বরভক্ত সাধুকে পত্নী ও আট নয়টী শিশু সন্তানের সহিত মধ্যে মধ্যে অনেকদিন উপবাসে কাটাইতে হইয়াছিল। ধনী লোকেরা বাহিরে ঈশ্বরোপাসকদিগকে স্তবস্তুতি করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের অন্নবস্ত্র অথবা বাসগৃহের জন্য যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দান করিতেও কুণ্ঠিত হয়। সুতরাং সাধুভক্তদিগকে অগত্যা বৃক্ষমূলে অনাহারে অথবা যৎসামান্য ভিক্ষার উপরে নির্ভর করিয়াই দিনাতিপাত করিতে হয়।

প্রবোধচন্দ্রকেও এখন বৃক্ষতল আশ্রয় করিতে হইয়াছে। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু সন্তানকে পথের ফকির হইতে হইয়াছে। বুঝি, দুঃখ না হইলে দুঃখহারা হরির কৃপা লাভ করা যায় না। সুখের কোলে বিলাসের শয্যায় শয়ন করিয়া মানব কখনই সেই দেবদুর্ল্লভ অমৃতরসের আস্বাদন পায় না। যাঁহারা "ঈশ্বর ঈশ্বর" করিয়া ফেরেন, অথচ বিন্দুমাত্রও কষ্ট স্বীকার করিতে রাজি নহেন, তাঁহাদের চীৎকার করাই সার হয়, তাঁহারা ঈশ্বরের ছায়ামাত্রও দর্শন করিতে পান না। অলস হইলে যেমন শরীর সুস্থ থাকে না এবং সাংসারিক ধনসম্পদ লাভ হয় না, তেমনই সুখের কোলে লালিত হইলে আত্মা কখনই সুস্থ থাকে না এবং আধ্যাত্মিক ধনসম্পদও লাভ হয় না। উপাসক! যদি সত্য সত্যই তোমার প্রাণের মধ্যে ভগ-

বানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, তবে কদাপি সুখশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিও না। সাধন-পথে যত বিঘ্ন আছে, সাংসারিক সুখ তাহাদিগের মধ্যে প্রবল। সাংসারিক সুখে মানুষকে যেমন অপদার্থ করিয়া ফেলে, এমন আর কিছুতেই নহে। যাহার গৃহে রাশি রাশি অন্নবস্ত্র সঞ্চিত আছে এবং যাহার ইঙ্গিতমাত্রেই দাস দাসীগণ অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করে, তাহার ভগবানকে ডাকিবার আবশ্যক কি? যাহার গৃহে অন্নবস্ত্রের অভাব, সেই ব্যক্তিই ছুটিয়া অন্নদায়িনী জননীর সমীপে আসিয়া থাকে। ধনী লোকেরা আপন আপন ধনের অহঙ্কারেই দিবানিশি প্রমত্ত, ঈশ্বরোপাসনায় তাহাদিগের অবকাশ কোথায়? ধনীদিগের হিতাহিত বিবেচনা অতি অল্পই এবং দুঃখীদিগের প্রতি সহানুভূতি মোটেই নাই। যদিও সকল ধনীরই এ ভাব সাধারণভাবে নাই, তথাচ অধিকাংশেরই আছে বলিয়াই ঈশা বলিয়াছিলেন, "সূচের ছিদ্রের ভিতরে উষ্ট্রের গমনাগমনও সম্ভবপর, কিন্তু ধনীলোকের স্বর্গদ্বারে প্রবেশ নিতান্তই অসম্ভব।" এবং সেইকারণেই শ্রীচৈতন্য ধনীর গৃহে পদার্পণ এবং এমন কি সময়ে সময়ে তাহাদিগের মুখাবলোকন পর্য্যন্তও করিতেন না। যদিও সংসার সম্বন্ধে এই কথাগুলি বড়ই রূঢ় হইতেছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্য সম্বন্ধে ইহার প্রত্যেক অক্ষর সত্য। নতুবা শাক্যসিংহ রাজতনয় হইয়াও সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সাধ করিয়া ভিক্ষুক হইতেন না, এবং কুন্তী ও দ্রৌপদী প্রভৃতি ঈশ্বরের নিকটে "আমাদিগের দুঃখ হউক." বলিয়া প্রার্থনা

করিতেন না। ভগবান যদিও সকল জীবে সমান দয়া-শীল, তথাচ দুঃখীরা তাঁহাকে লইয়া যত তৃপ্তি লাভ করে, এমন আর কেহই পারে না। দুঃখীর জন্যই শ্রীহরিকে "দীনবন্ধু" নাম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অতএব যাঁহারা দীনবন্ধুকে পাইতে চাহেন, তাঁহারা অবিলম্বে দুঃখকে প্রিয় বন্ধুবোধে আলিঙ্গন করুন।

প্রবোধ ইচ্ছা করিয়াই দুঃখকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। সেইজন্যই দুঃখে তাঁহার কিছুই দুঃখ নাই। যখন যে কষ্ট আসিতেছে, তিনি তাহাই অম্লানবদনে সহ্য করিতে-ছেন। শীতের হিমানী, নিদাঘের উত্তাপ, বর্ষার ধারা, এ সকলই তিনি সহ্য করিতে পারেন। অল্পাহারের বা অনাহারের কষ্ট, অপমান বা নির্য্যাতনের তীব্র জ্বালা, এ সকলের কিছুতেই তাঁহাকে আর চঞ্চল করিতে পারে না। তাই আজ তিনি প্রসন্ন মনে বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া প্রবল বৃষ্টিধারা সহ্য করিলেন। অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল; কিন্তু ঘোরান্ধকারের কোলে মধ্যে মধ্যে চপলা চমকিতে লাগিল। প্রবোধচন্দ্র বৈষ্ণবকে সঙ্গে লইয়া সতর্কতার সহিত নদীর ধারে ধারে একটা গ্রামের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘের অন্ধকারে মিশিয়া গাঢ়তর হইয়াছে। ঠিক সম্মুখের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কেবল বিদ্যুতা-লোকেই তাঁহারা পথ দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে হঠাৎ সিক্ত ভূমিতে পদস্খলন হওয়ায় প্রবোধচন্দ্র একেবারে গণ্ডকের গর্ভে পতিত হইলেন। পতিত হইবা-

মাত্রই চীৎকার করিয়া কহিলেন, "হরি হে! রক্ষা কর।" বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! আপনার উদ্ধারের জন্য কি করিব বলুন। ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িব কি?" প্রবোধচন্দ্র উত্তর দিলেন, "না, জলে নামিবার কোনই আবশ্যক নাই। তুমি ধারে ধারে চল, আমি স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি খরতর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। অন্ধকারে বৈষ্ণব ও প্রবোধ পরস্পরে কেহ কাহাকেই দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং বৈষ্ণব ডাকিলেন, "প্রভো! আপনি কোথায়?" প্রবোধচন্দ্র উত্তর দিলেন, "চল, আমি ভাসিয়া যাইতেছি।" ভাসিতে ভাসিতে প্রবোধ প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর! এ সময় তুমি কোথায় ঠাকুর? এই নদীর জলে তোমার প্রেম-হস্তের অবলম্বন পাইব না কি? প্রহ্লাদ ত গল-দেশে পাষাণ সত্ত্বেও তোমার নামের বলে সাগর-গর্ভে নিমগ্ন হয়েন নাই! তবে আজ তোমার দাস কি ডুবিবে? তুমি ত হরি সর্ব্বত্রই আছ, সকলই দেখিতেছ; তবে তোমার কাঙ্গাল দাস যে এই ঘোর বিপদে পড়িয়াছে, ইহাও ত তুমি দেখিতেছ। সত্যসত্যই তুমি কি আমাকে দেখি-তেছ? তবে আর আমার ভয় কি? যখন তোমারই প্রেমদৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছি, তখন আর আমার বিপদই বা কি? শিশু যদি মায়ের সম্মুখে থাকে, তবে কি সে আপনাকে বিপদাপন্ন মনে করে? মা! এই যে তুমি আমার সম্মুখে রহিয়াছ! তবে আমি তোমার কোলে উঠি।" এই বলিয়া তিনি যেমন দুই হস্ত প্রসারণ করি-

লেন, অমনই কি একটা কঠিন পদার্থ তাঁহার হস্তে ঠেকিল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ একবার বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইল। সেই আলোকে প্রবোধচন্দ্র দেখিলেন যে, তিনি একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের আশ্রয় পাইয়াছেন। প্রাণে একটু আশা হইল, দুই হস্তে বৃক্ষের শাখা ধারণ পূর্ব্বক তাহার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং তীরস্থ সঙ্গীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে ভাই! আর ভয় নাই। অভয়দাতা ভগবান একটা আশ্রয় দিয়াছেন। আমি একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপর উঠিয়া বসিয়াছি। তুমি একবার প্রাণ ভরিয়া হরি হরি বল।" সঙ্গী ভক্তিভরে "হরি হরি বোল" বলিয়া প্রবোধকে কহিল, "আমি জানি, আপনার কোনও বিপদ নাই; কেন না, বিপদহারী ভগবান আপনার সহায়। এক্ষণে ধীরে ধীরে তীরে উঠিবার চেষ্টা করুন।" আর একবার বিদ্যুতালোক প্রকাশ হওয়ায় প্রবোধচন্দ্র দেখিতে পাইলেন যে, উক্ত বৃক্ষের মূলদেশ তীরে মৃত্তিকায় সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তখন তিনি ধীরে ধীরে উহার শাখা প্রশাখা ধারণ পূর্ব্বক তীরে উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গী যে পথ দিয়া চলিতেছেন, তিনি সে পথে উঠিতে পারিলেন না। হঠাৎ কিয়দ্দূরে একটী ক্ষীণ আলোকশিখা দেখিতে পাইয়া অতি কষ্টে কর্দ্দম ও কণ্টকাবৃত স্থান দিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বহু বিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একখানি নৌকার উপর একজন মাঝি বসিয়া গান করিতেছে।

প্রবোধচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! এই গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিবার পথ কোন্ দিকে আমাকে দেখাইয়া দিবে?" মাঝি বলিল, "আপনি কে? কোথা হইতে আসিতেছেন?" প্রবোধচন্দ্র উত্তর দিলেন, "আমি একজন ফকির, বঙ্গদেশ হইতে আসিতেছি। আসিতে আসিতে হঠাৎ উপরের পথ হইতে নদীর জলে পড়িয়া গিয়াছিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের আশ্রয় পাইয়া অতি কষ্টে তীরে উঠিয়াছি।" মাঝি শুনিয়া চমকিয়া কহিল, "আপনি অত উচ্চ তীর হইতে নদীর গর্ভে পড়িয়া গিয়াছিলেন! আপনার বড়ই পুণ্যের জোর তাই জীবিত আছেন, নতুবা ওখান হইতে পড়িলে কেহই প্রাণে বাঁচে না।" এমন সময়ে প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গী বৈষ্ণব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাঝি আবার বলিল, "গ্রামে প্রবেশ করা বড়ই দুঃসাধ্য। জলে পথে কাদা হইয়াছে, এবং পথের দুই পার্শ্বে কাঁটাগাছ, সম্মুখে ঘোর আঁধারময় বাঁশবন। আলোক ব্যতীত যাইবার কোনই উপায় নাই।" প্রবোধ বলিলেন, "যদি ভাই! তুমি দয়া করিয়া একটী আলোক দেও, তাহা হইলেই আমরা কোন রূপে গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইতে পারি।" মাঝি বলিল, "আপনি সাধু ব্যক্তি; আপনাকে আলোক দিতে আমার কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু লণ্ঠন বিনা এই প্রবল বাতাসে আলোক কখনই যাইবে না। আমার এখানেও লণ্ঠন নাই।" প্রবোধচন্দ্র একটু বিষণ্ণ হইলেন। এমন সময়ে আবার বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। "তাইত, হরি

হে! এখন উপায় কি?" বলিয়া তিনি একটী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। হঠাৎ মাঝির যেন কি একটা বস্তু মনে পড়িল। সে হর্ষযুক্ত হইয়া কহিল, "মহাশয়! ভাবনা নাই, একটা উপায় হইয়াছে।" এই বলিয়া নৌকার ভিতর হইতে একটা নূতন হাঁড়ি বাহির করিয়া বলিল, "মহাশয়! এই হাঁড়ির মধ্যে আলোক জ্বালিয়া লইয়া যাউন। যেখানে আবশ্যক হইবে, সেখানে হাঁড়ি হইতে আলোকটা এক একবার বাহির করিয়া পথ দেখিবেন।" প্রবোধ ঠাকুরকে বারম্বার নমস্কার করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "হরি হে! তোমার দাসের বোধ হয় কোথাও বিপদ নাই।" মাঝিকে নমস্কার করিয়া তাঁহারা দুইজনে হাঁড়ির মধ্যে আলোক লইয়া ধীরে ধীরে গ্রামাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

অনেক বিলম্বে অতি কষ্টে তাঁহারা গ্রামের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমুদায় গ্রাম অন্ধকারময় এবং নিস্তব্ধ। কোন গৃহেই আলোক দৃষ্ট হইতেছে না। অপরিচিত দেশে আঁধার রজনীতে কাহার গৃহে যে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবে ভরসার মধ্যে ভগবানের নাম। অন্ধকার রজনীতে মানুষ ঘুমায়, কিন্তু সেই সর্ব্বদর্শী বিধাতা পুরুষ জাগরিত থাকিয়া সকলই দর্শন করেন। গ্রামস্থ নরনারী সকলেই নিদ্রিত বটে, কিন্তু ঐ দেখ, এক জন করুণাময় দীনবৎসল নিরাশ্রয়ের আশ্রয় জাগরিত রহিয়াছেন। বিজন কাননে বিপ্রহরা যামিনীতে নিদ্রিতা

বিহঙ্গিণীর ক্রোড়স্থ শিশু শাবকদিগকে যিনি রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্ত্তা ভগবান এই দুইজন অপরিচিত বিদেশী পথিকের সম্মুখে আসিয়া মাভৈঃ রবে আশ্বাস প্রদান করিলেন। প্রবোধচন্দ্র সঙ্গীকে কহিলেন, "বল ভাই! ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।" দুই জনে বিশ্বাসের সহিত আকাশের পানে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।" সাধকের কণ্ঠোচ্চারিত ধ্বনিতে নিবিড় আঁধার রাশি যেন কম্পিত হইল। নিকটবর্ত্তী একটা বৃক্ষ শাখায় একটা পাখী ঘুমাইয়াছিল, সে গা ঝাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিল, এবং সম্মুখস্থ একখানি গৃহ হইতে একজন পুরুষ বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রিতে আপনারা কে?" প্রবোধচন্দ্র উত্তর দিলেন, "আমরা দুইজন ফকির, বঙ্গদেশ হইতে আসিতেছি। আপনার গৃহে অদ্য রাত্রির জন্য আশ্রয় পাইতে পারি কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "আসুন মহাশয়! আমার গৃহে আপনারা অনায়াসেই আশ্রয় পাইবেন। আমিও একজন বঙ্গদেশবাসী।" প্রবোধ এবং তাঁহার সঙ্গী সেই ব্যক্তির গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সেই গৃহটী একখানি দোকান এবং সেই গৃহস্বামী একজন দোকানদার। দোকানদার জাতিতে কায়স্থ, তাঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকাকালনা। তিনি প্রবোধচন্দ্রকে পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন। ক্ষণকাল বিশ্রাম এবং নানাবিধ কথোপকথনের পর দোকান-

দার বলিলেন, "মহাশয়! রাত্রি অনেক হইয়াছে, এক্ষণে আহারাদির আয়োজন করিলে ভাল হয়। কিন্তু একটা বড়ই অসুবিধা দেখিতেছি; আমার দোকানে আহারীয় সমুদায় সামগ্রীই আছে, কেবলমাত্র হাঁড়ি নাই।" প্রবোধচন্দ্র বলিলেন, "ভয় নাই মহাশয়! আপনার এখানে হাঁড়ির অভাব আছে জানিয়াই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান পূর্ব্বেই আমাদিগকে একটী হাঁড়ি দিয়াছেন।" দোকানদার আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ?" তখন প্রবোধচন্দ্র আদ্যোপান্ত সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করিলে দোকানদার অবাক্ হইয়া গেলেন। ঈশ্বরের এত দয়া! সামান্য মানবের জন্য ভগবান এত ভাবিয়া কার্য্য করেন! তবে তাঁহার হস্তে বিশ্বাস করিয়া প্রাণ সঁপিয়া দিতে ভয় কি? তিনি যখন এত সূক্ষ্ম বিষয়েও মানুষের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তখন তাঁহাকে ভুলিয়া থাকাই যে আমাদের নিতান্ত ভ্রম! হরি হে! ক্ষমা কর, আমি না জানিয়া তোমাকে ভুলিয়া যাই। প্রতি পলকে তুমি আমাকে রক্ষা কর, কিন্তু আমি তোমাকে একবারও দেখি না। দোকানদারকে অবাক্ হইতে দেখিয়া প্রবোধচন্দ্র বলিলেন, "মহাশয়! যে বিধাতা শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য জন্মের পূর্ব্ব হইতেই মাতৃস্তনের রক্তধারাকে দুগ্ধধারাতে পরিণত করেন, সেই বিধাতাই আমাদের আবশ্যক বুঝিয়া পূর্ব্ব হইতেই একটী হাঁড়ির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতি পলকেই তিনি আমাদের নিকটস্থ সহায় এবং বন্ধু, অজ্ঞানবশতঃ আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।" পাঠক পাঠিকা! এই

ঘটনাটী কল্পনা নহে, সত্যসত্যই আমার কোন পরিচিত বন্ধুর জীবনে এইরূপ ঘটিয়াছিল। তোমরা বল, নিজে না করিলে এ সংসারে কিছুই হয় না, কিন্তু আমি বলি, ভগবান না করিলে কিছুই হয় না। তিনি আমাকে জাগরিত করেন, তাই আমি প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হই; তিনি আমাকে আহার দেন, তাই আমি আহার পাই। তিনি যাহা দেন তাহাই পাই এবং যাহা না দেন তাহা পাই না। প্রত্যেক বায়ুবিন্দুর সহিত আমার প্রেমময় শ্রীহরি আমাদের সেবা করিয়া বেড়াইতেছেন। ভগবতী যে শুদ্ধ রামপ্রসাদেরই বেড়ার বাঁধন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি আমাদের প্রত্যেকেরই গৃহ সংসারের সমুদায় কার্য্যই স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতেছেন; কেবল জ্ঞানের অভাবেই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। যে কার্য্যে আমাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি কুলায় না, প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যাহা আমরা সম্পন্ন করিতে পারি না, তাহা যদি হঠাৎ সুসম্পন্ন হয়, তবেই বিশ্বাস করি যে, উক্ত কার্য্য ভগবান নিজে করিলেন। নতুবা যাহা আমাদের শক্তিপ্রয়োগে সম্পন্ন হয় এবং যে সকল ব্যাপার প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে, তাঁহাদের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করি না। প্রবোধচন্দ্রকে হাঁড়ি দান করা, আমাদের বুদ্ধিতে আসে না, মানুষ এখানে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না, সুতরাং একার্য্যটী ঈশ্বর করিলেন বলিয়া স্বীকার না করিলে চলে না। দয়াময় শ্রীহরি যে প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, নদী-

গর্ভে বৃক্ষের আশ্রয় লাভ এবং মাঝির নিকটে হাঁড়ি প্রাপ্তি, এই দুই ঘটনাতেই তাহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইতেছে। প্রবোধচন্দ্র বারম্বার বিমুগ্ধ ভাবে দীনবন্ধু ভগবানের চরণে নমস্কার করিতে লাগিলেন। সঙ্গী বৈষ্ণব ব্যাপার দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। এই দিন অবধি দোকানদারের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি প্রবোধচন্দ্রকে দুই এক দিন সেখানে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু প্রবোধ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। পর দিন প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ফকিরদ্বয় বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পর্ব্বতশিখরে।

হিমালয়ের যে অংশে মানসসরোবর অবস্থিত এবং যেখান হইতে শতদ্রু নদী উৎপন্ন হইয়া পঞ্জাবভূমি অভিসিক্ত করিতেছে, ক্রমাগত চলিতে চলিতে তাঁহারা পর্ব্বতের সেই অংশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারিদিকের পর্ব্বতমালা তুষারে আবৃত, শৈত্যাধিক্য প্রযুক্ত তথায় কোন মানব সহজে গমন করিতে পারে না। কেবলমাত্র বিজন বিপিনে বিপিনবিহারিণী মৃগবধূর সচঞ্চল পদনিক্ষেপে আত্মসৌন্দর্য্যে বিভোরা নবীনা মাধবী আলুথালু কেশে পাষাণ-শয্যায় লুণ্ঠিতা হইতেছে এবং মুক্তাফল সদৃশ শত সহস্র বারিবিন্দু নির্ম্মল নির্ঝরিণীর তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া নিম্নপ্রদেশাভিমুখে ছুটিতেছে। প্রবোধচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গী ধীরে ধীরে তথায়

এক গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কত শত প্রকার বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত বনজাত কুসুমে দশদিক আলোকিত করিয়াছে এবং তাহাদের হৃদয়নিহিত অপূর্ব্ব সুধাগন্ধে বনবিভাগ বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রবোধ-চন্দ্র সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাবাজি! শুনি-য়াছি হিমগিরির এই প্রদেশেই কৈলাস পর্ব্বত অবস্থিত। মহাযোগী মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত এই স্থানেই অধিষ্ঠান করিতেন। প্রাচীন যোগীগণ অনেকে এই স্থানেই সমাধি মগ্ন ছিলেন; এই প্রস্তরভূমি, এই প্রাচীনতম পাদপমালা এবং এই পুরাতন গিরিকন্দর সকল যেন তাহারই আভাস প্রদান করিতেছে। এমন পবিত্র ভূমি পৃথিবীতে আর নাই, কেন না, দলে দলে যোগীন্দ্রমুনীন্দ্র আর কোথাও কখন অবস্থান করিতেন না। এই বনে হিংসা নাই দ্বেষ নাই, বিবাদ নাই কলহ নাই, অভিমান নাই অহঙ্কার নাই। এখানে কেবল ব্রহ্মানন্দ চিরপ্রকাশিত। ঐ দেখ, শ্যামল পল্লবশ্রেণীর নবসৌকুমার্য্যে চিরসুন্দর শ্রীহরির রূপের আভা প্রতিফলিত হইয়াছে। হাস্যমুখী বনবল্লরী স্তরে স্তরে কুসুমসম্ভার মস্তকে লইয়া সেই ভুবনমোহন দেবতার পূজার আয়োজন করিতেছে। চন্দনতরু আপনার অতুল সুষমায় তাঁহারই জীবন্ত আবির্ভাব প্রকাশ করিতেছে। আবার দেখ, শুকসারী কেমন নীরবে শীতল পল্লবান্তরালে বসিয়া আছে। যেন উহারা বিশ্ববিমোহন হরির রূপ-সাগরে একেবারে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। উহাদিগকে দেখিলেই মনে হয়, যেন কোন সুনিপুণ চিত্রকর তুলিকা

হস্তে লইয়া এই মধুর দৃশ্যপট সযতনে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শুন, কোকিলকোকিলা চন্দনের সুগন্ধময় সমীরহিল্লোলে রহিয়া রহিয়া এক একবার কেমন ঝঙ্কার করিতেছে। আহা! এমন সুস্নিগ্ধ এমন প্রাণমন বিমোহিনী প্রকৃতি ত কোথাও দেখি নাই!"

বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! সত্যসত্যই কি এখানে হরপার্ব্বতী বিরাজ করিতেন? সত্যসত্যই কি দেবতারা সময়ে সময়ে সদলে এখানে আসিয়া ক্রীড়াকৌতুক করিতেন?"

প্রবোধচন্দ্র উত্তর দিলেন, "কবির কল্পনা পার্ব্বতীয় প্রকৃতিকে এমনই সজীব চিত্রে চিত্রিত করিয়াছে যে, সাধারণ লোকে সত্যসত্যই একজন দেবীর আবির্ভাব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। বাস্তবিকই, এই পর্ব্বতের অলৌকিক শোভা এতই চিত্তবিনোদন যে, প্রকৃতি দেবীকে এইখানে যেন মূর্ত্তিমতী বলিয়াই মনে হয়। এই মূর্ত্তিমতী প্রকৃতিই পার্ব্বতী বলিয়া কথিত এবং এই প্রকৃতির পতি পরব্রহ্মই মহাদেব রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সত্যসত্যই, জীবন্ত পুরুষ ও প্রকৃতি এই হিমাচলশিরেই বিরাজমান। এখানে আসিলে যত শীঘ্র এবং যত সহজে ব্রহ্মদর্শন হয়, এমন কোথাও নহে। সেইকারণেই যোগাগণ সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া চিরজীবন এই শৈলেন্দ্রশিখরেই অতিবাহিত করিতেন। শাস্ত্রে তাঁহাদিগকেই দেবতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আহা! ঘোর পাষণ্ডও যদি একবার এই মহাতীর্থে প্রবেশ করে, স্থানের গুণে

তাহার প্রাণেও ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। এখানে আসিলে আর মনে হয় না যে, লোকালয়ে গিয়া আবার সংসার ক্রীড়ায় মত্ত হই। এখানকার সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণা প্রকৃতি-জননীর অতুল ক্রোড়ে একবার শয়ন করিলে আর কাম ক্রোধাদি রিপুগণের চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা বাল্যকাল অবধি এই শান্তরসাস্পদ তপোবন-প্রাঙ্গণে সরল মৃগশিশুর সঙ্গে পবিত্র ক্রীড়া-কৌতুকরঙ্গে লালিত পালিত হইয়াছিলেন!” বলিতে বলিতে তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিলেন, “বাবাজি! আমার মত মহাপাতকীর সংস্পর্শে এই পুণ্য তীর্থ অপবিত্র হইতেছে। আমি যেরূপ ভীষণ পাপকার্য্য সকল সাধন করিয়া আমার পবিত্র বাল্যজীবনকে কলঙ্কিত করিয়াছি, মনুষ্য হইয়া এমন আর কেহই পারে না।” বলিতে বলিতে তাঁহার মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া গেল; তিনি ধীরে ধীরে একটী শীতল অশোকতরুর মূলে উপবেশন করিলেন।

প্রবোধের কথা শুনিয়া বৈষ্ণবের প্রাণটাও যেন কেমন অস্থির হইয়া উঠিল। কে যেন অলক্ষিতে আসিয়া তাঁহার মনের শান্তিফুলটী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া গেল। তিনি ক্ষণ-কাল নীরব থাকিয়া হঠাৎ চীৎকার পূর্ব্বক কাঁদিয়া প্রবো-ধের পদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, “প্রবোধরে! ভাই! আমার হৃদয়োচ্ছ্বাস হৃদয়ে আর ধরিতেছে না। হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে! আমি তোর হতভাগা বন্ধু শ্যামদাস!” বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রবোধচন্দ্র অবাক্

হইয়া কিয়ৎকাল নীরবে রহিলেন; পরে শ্যামদাসের চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "শ্যামদাস! ভাই! ভগবানের কৃপায় আজ অসম্ভব সম্ভব হইল। কখন মনেও হয় নাই যে, আমার সন্ন্যাসব্রতে তুমি সঙ্গী হইবে। বাল্যকালে তোমার সঙ্গে কত আমোদপ্রমোদে ক্রীড়া করিয়াছি, যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসে তোমার সঙ্গে কতই ভয়ঙ্কর মহা মহা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, এখন আবার তোমার সঙ্গে মধুমাখা হরিনাম গান এবং হরিরূপ দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছি। কিন্তু ভাই শ্যামদাস! আমরা যে সকল ভীষণ পাতক সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাদের কি কোনও কালে ক্ষয় হইবে? হায় রে ভাই! এমন ভূলোক-স্বর্গে আসিয়াও আমাদের প্রাণের জ্বালা নিবিল না!"

শ্যামদাস বলিলেন, "প্রবোধ! ভগবানের আশীর্ব্বাদে তুমি ধন্য হইয়াছ। তোমার সমুদায় পাপ দূরে গিয়াছে। হরিভক্তিতে তোমার প্রাণ পূর্ণ হইয়াছে। এরূপে পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য শোক করা তোমার উচিত নহে। আমি তোমার সমুদায় সংবাদই অবগত হইয়াছি। আনন্দ-আশ্রমে সাধুগণের সঙ্গে তুমিও সাধু হইয়াছ; শ্রীহরি কৃপা করিয়া তোমাকে আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছেন। আমি যেমন মহাপাপী, তেমনই রহিয়াছি। আমার গতি কি হইবে? ভাই! আজ হইতে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম; আমি আর তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না। প্রবোধ! তুমি কি আমাকে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিবে?"

প্রবোধচন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "শ্যামদাস!

আমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার কি লাভ হইবে? আমি নিজেই হরিধনের কাঙ্গাল, তবে আবার তোমাকে কি দিব? দীনবন্ধু আমাকে দয়া করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমার এমন কোনই শক্তি হয় নাই, যাহাতে তোমাকে কিছু উপদেশ দান করিতে পারি। তোমার মন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া, আমি যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত। বুঝিলাম শ্রীহরি সত্যসত্যই পাষণ্ডদলন; নতুবা তিনি কখনই আমার এবং তোমার মত মহাপাষণ্ডদিগকে অনুতপ্ত করিতেন না। শ্যামদাস! তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর, আনন্দ-আশ্রমে গিয়া মহর্ষি যোগানন্দের নিকটে ব্রহ্মচর্য্য সাধন কর; তাঁহার দয়া হইলেই তুমি ব্রহ্মদর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইবে।” শ্যামদাস কাতরভাবে কহিলেন, “প্রবোধ! আমি মনে মনে তোমাকেই আমার উপদেষ্টা গুরু রূপে বরণ করিয়াছি; আমি তোমাকে ছাড়িয়া আর কোথাও গমন করিব না। আমি চিরকাল তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার সেবা করিয়া মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। যদি তুমি আমাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেও, তাহা হইলেও আমি তোমার সঙ্গ ছাড়িব না।

শ্যামদাসকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রবোধচন্দ্র কহিলেন, “শ্যামদাস! আমি তোমাকে বড়ই ভালবাসি। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু শুদ্ধ আমার সঙ্গে থাকিলে কি হইবে? যে মহামূল্য রত্নের জন্য পথের ফকির হইয়াছ, তাহা ত লাভ করিতেই হইবে। নতুবা বৃথা পণ্ডশ্রমে কি আবশ্যক?”

শ্যাম। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, তোমার নিকটে থাকিলেই আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিব। তুমি যে সত্য সত্যই একজন মহা সাধু হইয়াছ, তাহা তুমি নিজে বুঝিতে পারিতেছ না; সেইজন্যই আমাকে তোমার সঙ্গ ছাড়িতে বারম্বার অনুরোধ করিতেছ। কিন্তু আমি জানিতেছি যে, তুমি এখন একজন প্রকৃতই মহাপুরুষ। আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না।

প্রবোধ। যখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তোমার একান্তই অনিচ্ছা হইতেছে, তখন আমিও আর তোমাকে যাইতে বলিব না। রক্ষাকর্ত্তা ভগবান আমাকে একাকী দেখিয়াই বোধ হয় তোমাকে আমার সঙ্গী করিয়া দিয়াছেন। তোমার যত দিন ইচ্ছা আমার সঙ্গে অবস্থান কর।

শ্যামদাস আনন্দে অধীর হইয়া প্রবোধের পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রভো! অদ্য হইতে আপনি আমার জ্ঞানদাতা গুরু হইলেন, আমি আপনার পদানত শিষ্য হইলাম। আমাকে আপনি অদ্য দীক্ষিত করুন। আর আমি আপনাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিব না।" প্রবোধচন্দ্র তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "ভাই! আমার ঠাকুর বলিয়াছেন, আমি চিরদিনই জগতের সমুদায় নরনারীর দাস, আমি কখনও কাহারও গুরু হইতে পারিব না; অতএব আমাকে আর গুরু বলিয়া ডাকিও না।" শ্যামদাস উত্তর দিলেন, "আমি একবার যাহা দেবতাকে সাক্ষী করিয়া স্বীকার করিয়াছি, কিরূপে

তাহা অস্বীকার করি বলুন? হায়! আমি পাপের যাতনায় অস্থির হইয়া ঘুরিতেছিলাম, শান্তিদাতা পুণ্যময় হরি আমাকে দয়া করিয়া আপনার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। আপনিই আমার উপদেষ্টা গুরু, এবং আমি আপনার পদানত শিষ্য।”

প্রবোধচন্দ্র কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, “বেলা অধিক হইয়াছে, চল ঐ নির্ঝরিণীর সুনির্ম্মল সলিলে স্নান করিয়া উপাসনা আরম্ভ করি।” উভয়ে সমীপবর্ত্তী প্রস্রবণের সুশীতল জলধারায় স্নান করিতে লাগিলেন। প্রবোধচন্দ্র স্নান করিতে করিতে বলিলেন, “দেখদেখি শ্যামদাস! অতুলকর্ম্মা বিশ্বরচয়িতার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! পাষাণের বক্ষঃ বিদারণ পূর্ব্বক তিনি কেমন সুন্দর জলরাশিকে প্রবাহিত করিয়া সমুদায় পৃথিবীকে সরস করিতেছেন। জলে যে শুদ্ধ পৃথিবী সরস হয়, তাহা নহে, জলে আত্মাও সরস ভাব ধারণ করে। স্নানান্তে মানব-শরীর স্নিগ্ধ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও সুস্থতা লাভ করে। এই হেতুতেই প্রাচীন ভক্তগণ ঈশ্বরোপাসনার পূর্ব্বেই স্নানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্নান না করিয়া উপাসনা করিবার নিয়ম নাই। বিশেষতঃ, জলে হরির মুখচ্ছবি অতি সহজেই দর্শন করা যায়। জলের মধ্যে অবগাহন করিয়া যোগীগণ ব্রহ্মসত্তায় অবগাহন অনুভব করে। অতএব শান্ত এবং সমাহিত হইয়া স্নানকার্য্য সমাপন কর, এবং জলের মধ্যে সেই অস্পর্শ ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়া জীবন্মুক্ত হও। দেখ শ্যামদাস! এই পৃথিবীতে এমন একবিন্দু ধূলিও নাই,

যাহার ভিতরে ব্রহ্মকে দেখা না যায়। জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজমান। তাঁহাকে সর্ব্বস্থানে দর্শন করিয়া ভক্তি সহকারে বারবার নমস্কার করিলে জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। এই জলে তিনি, এই প্রস্তররাশিতে তিনি, ঐ সম্মুখস্থ বনস্পতিতে তিনি, ঐ উর্দ্ধে গগনতলে তিনি, জ্ঞান-নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক এই প্রকাশমান যোগেশ্বর মহাদেবকে সন্দর্শন কর, এখনই তোমার সমস্ত যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইবে।"

স্নান সমাপন করিয়া তাঁহারা এক শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক উপাসনা আরম্ভ করিলেন। একে হিমাদ্রি-শিখরের অনুপম সৌন্দর্য্য, প্রকৃতি সুন্দরী যেন স্বতঃই সহস্র অঞ্জলিতে শ্রীহরির শ্রীচরণে ফুলচন্দন অর্পণ করিতেছেন, তাহাতে আবার প্রেমোন্মত্ত প্রবোধের প্রেমভরা সঙ্গীতে বনভূমি যেন স্বর্গভূমি হইয়া উঠিল। প্রবোধচন্দ্র গাহিলেন—

"অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি,
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।"

তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে সমস্ত বনপ্রদেশ যেন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। অচলরাজ যেন আনন্দে গলিয়া শত সহস্র ধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং নানাবিধ পাদপশ্রেণী ও ললিতা লতিকাগুচ্ছ রাশি রাশি সুগন্ধি পুষ্প অর্পণ করিয়া সুকোমল দেবতার মহাপূজায় যোগদান করিল। প্রবোধচন্দ্র আবার গাহিলেন—

"সকল তরুরাজি সাজি ফুলফলে গাওরে,
বিহঙ্গকুল গাও আজি মধুরতর তানে।"

তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াই যেন কাননচারী বিহঙ্গকুল মধুরতর তানে একবার ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। প্রবোধচন্দ্র আবার গাহিলেন —

"গাও জীবজন্তু আজি যে আছ যেখানে,
জগৎপুরবাসী সবে গাও অনুরাগে ;
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে,
ডাক নাথ ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি।"

উপাসনান্তে এক বৃক্ষতলে প্রবোধচন্দ্র শয়ন করিলেন, এবং শ্যামদাস বনফল আহরণের জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ বনাভ্যন্তরে এক অমৃত-নিস্যন্দিনী সঙ্গীতস্বর শ্রবণে প্রবোধচন্দ্র সচকিত হইলেন। আহা! এমন মধুমাখা কণ্ঠধ্বনি ত কখনও শ্রবণ করি নাই। এ কি কোন দেবতার সঙ্গীত? মনুষ্যলোকে এমন সঙ্গীত সুদুর্লভ। এ সঙ্গীতে যে প্রাণের ভিতরে শত শত ভাবের উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইতেছে। প্রবোধচন্দ্র, যে দিক হইতে সঙ্গীতলহরী আসিতে লাগিল, সেই দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। অনতিবিলম্বে এক অদৃষ্টপূর্ব্বা অপরিসীমরূপযৌবনশালিনী দিব্যলাবণ্যা কন্যা ঘনঘোর চিকুরজাল পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে নানাবিধ বনফুলের মালা শোভা পাইতেছে। প্রবোধ এ জীবনে এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রাশি কোথাও দর্শন করেন নাই। যেন বনদেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন, অথবা তাঁহার সাধনায় পরিতুষ্টা হইয়া দেবী ভগবতী স্বর্গলোক হইতে কোন সুর-

বালাকে প্রেরণ করিলেন। প্রবোধচন্দ্র তাঁহার মাধুরী দেখিয়া আত্মহারা হইলেন। রমণী নিকটে আসিয়াই তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সন্ন্যাসি! ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় বড়ই আকুল হইয়াছ। এই ঘোর অরণ্যে তোমাকে আহার দিতে কেহই নাই জানিয়া, আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি। যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমার সঙ্গে আগমন করিলে, অদূরেই তুমি দেবলোকভোগ্য অপূর্ব্ব আহার ও পানে পরিতৃপ্ত হইবে।"

তাঁহার সুমধুর রূপলাবণ্যে এবং সুমধুর বাক্যবিন্যাসে প্রবোধের মন বিগলিত হইয়া গেল। তিনি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? আপনি কি কোন দেবতা?" রমণী উত্তর দিলেন, "আমি এই পর্ব্বতের অধিপতি যক্ষরাজের কন্যা। আমার নাম প্রেয়। কুবেরের সমুদায় ধনরত্ন এবং রাজ্যঐশ্বর্য্য আমারই হস্তগত আছে। যাহারা মনুষ্যলোক হইতে এই অচলশিরে "হরপার্ব্বতী" দর্শন করিতে আইসে, আমিই তাহাদিগকে আমার ভবনে লইয়া গিয়া সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকি। দেবী ভগবতীর আমিই প্রধান কিঙ্করী। আমার সঙ্গে যিনি আগমন করেন, তিনিই দেবীকে দর্শন করিয়া সুখশান্তি লাভ করেন। তুমি যদি ভগবতীকে দর্শন করিতে বাসনা করিয়া থাক, তবে আমার সঙ্গে আগমন কর।" প্রবোধচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সঙ্গে যাইলে কি কি সুন্দর বস্তু দর্শন করিতে পাইব?" প্রেয় উত্তর দিলেন, যে সকল সুখসম্পদের জন্য নরনারীগণ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের

নিকটে প্রার্থনা করিয়া থাকে সেই অতুল ধনমান, বিষয় বিভব, বিদ্যাসৌন্দর্য্য, স্ত্রীপুত্রকন্যা, দাসদাসী, এই সমুদায়ই আমার ভবনে চিরবিদ্যমান। স্বর্ণ অট্টালিকা, সুবর্ণের কল্পতরু, তাহার শাখায় শাখায় অয়স্কান্ত ও নীলকান্ত মণির অপূর্ব্ব কুসুমহার এবং চিরসুমিষ্ট ও চিরসুপক্ক দিব্যফলসম্ভার, যাহার অমৃতময় রস একবার আস্বাদন করিলে নরনারীর রোগশোকজরাগ্রস্ত দেহ নবকান্তি-বিশিষ্ট দেবদেবীর ন্যায় চিরযৌবনশ্রী প্রাপ্ত হয়। উক্ত কল্পতরুর পল্লবান্তরালে কত শত সুস্বর পক্ষী মধুর কণ্ঠে মধুরিমা বিকীর্ণ করিয়া সমুদায় পর্ব্বতকে বিমোহিত করিতেছে। কল্পপাদপের মূলদেশে এক অমৃতের স্রোতস্বিনী দিবানিশি কুলকুলরবে কুবের-ভবনকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে, এবং কত শত স্বর্ণকান্তি ও রজতপ্রভ মৎস্য হীরকের নয়নদ্বয়ে সুশোভিত হইয়া উলটি পালটি করিয়া সেই অমৃততটিনীতে ক্রীড়া করিতেছে, যাহা দর্শন করিলেই স্বতঃই মনোবাসনা হয় যে, সকল ছাড়িয়া দিবানিশি এই শৈবলিনী-বক্ষে ঐ সকল মৎস্যের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে উন্মত্ত হইয়া থাকি। আর এই কুবের-নিলয়ে কতই যে কিন্নরকিন্নরীর প্রাণোন্মাদিনী সঙ্গীতলহরী দিবানিশ উত্থিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে বল? আর অধিক কথায় প্রয়োজন কি, কুবেরের ভাণ্ডার এইখানে বিদ্যমান আছে, ত্রিজগতে যাহা নাই, তাহা এইখানে চির বিরাজিত।”

কুবেরালয়ের বর্ণনা শ্রবণে প্রবোধের প্রাণ বিমোহিত

হইয়া গেল। 'যদি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এই দুরারোহ অচল-শিখরে সমুপস্থিত হইয়াছি, তবে একবার ধনপতি কুবেরের ভাণ্ডার দর্শন করিয়া যাইলে ক্ষতি কি? বিশেষতঃ, প্রেয় নিজে আসিয়া সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার জন্য এত অনুরোধ করিতেছেন।' মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া প্রবোধচন্দ্র বলিলেন, "আমি আপনার সঙ্গে গমন করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমার প্রিয় সঙ্গী এবং প্রিয় বন্ধু শ্যামদাস ফলান্বেষণে গমন করিয়াছেন, তিনি প্রত্যাগমন করিলে একত্রে উভয়েই আপনার সঙ্গে কুবের-নিকেতনে গমন করিব।" প্রেয় উত্তর দিলেন, "তুমি নিজ সাধনাবলে কুবের-ভবনে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছ, কিন্তু শ্যামদাসের এমন কি সাধনা হইয়াছে যে, তিনি আমার সঙ্গে তথায় গমন করিবেন? যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমার সঙ্গে এখনই আগমন কর, আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না।"

প্রেয়ের রূপলাবণ্য দর্শনে এবং গম্য প্রদেশের অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব শ্রবণে প্রবোধচন্দ্র এতই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, শ্যামদাসের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়াই প্রেয়ের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। মানব যখন সাংসারিক সুখের প্রলোভনে পড়ে, তখন তাহার হিতাহিত বিবেচনা কিছুই থাকে না। অন্ততঃ, সে একবার আপনাকেও আপনি জিজ্ঞাসা করেনা যে, সে কোন্ স্রোতে পড়িয়া কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। অমুক স্থানে যাইলে সাংসারিক সুখ পাওয়া যাইবে শুনিলেই অমনই সে সেই

দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ায়। সাংসারিক লোকের ত কথাই নাই, সাধু ভক্ত বৈরাগীগণও সময়ে সময়ে সাংসারিক সুখের প্রলোভন-স্রোতে ভাসিয়া গিয়া থাকেন। আজ প্রবোধচন্দ্র কত সাধনের পরেও সাংসারিক সুখের প্রলোভনে পড়িয়াছেন। যিনি একসময়ে দেবদূতের পরীক্ষায় ভুলেন নাই, যিনি পিতার অতুল ধনসম্পদ থাকিতেও তপোবনে ঋষিগণের সঙ্গে ভিক্ষা করিয়া উদরপূরণ করিতেন, এবং যিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া জমিদার রাজীবলোচনের বিষয়বিভব এবং সুন্দরী কন্যার লোভ অনায়াসেই পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই আজ প্রেয়ের বিচিত্র মায়া-জালকে ছিন্ন করিতে পারিলেন না। সাধক! তুমি এজীবনে কোথাও নিরাপদ নহ। প্রেয় তোমাকে তোমার সাধনপথ হইতে স্খলিতপদ করিবার জন্য দিবানিশি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে। অতএব সাবধান হইয়া সংসার-পথে পদ নিক্ষেপ করিবে।

প্রবোধচন্দ্র নিতান্ত বিমোহিতভাবে প্রেয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে ক্রমে তাঁহারা নানাবিধ বিচিত্র শোভাসমন্বিত বনপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া কুবেরালয়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানকার এমন সুন্দর শোভা যে প্রবোধচন্দ্র তদ্দর্শনে একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া গেলেন। কোথায় যাইতেছেন, কি করিতেছেন, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কাঞ্চনবর্ণ সৌধশ্রেণীর অপূর্ব্ব সমাবেশ, কল্পদ্রুম ও কল্পলতিকার ভুবনবিমোহিনী রূপচ্ছটা, চিরফলাবনত সহকারপল্লবকোলে

বসন্তসোহাগিনী কোকিলবধূর প্রণয়রাগভরা সঙ্গীতস্রোত, এবং প্রফুল্লচম্পকপ্রভ নৃত্যগীতপরায়ণ দেবোপমকুমার-কুমারীগণের বিচিত্র ক্রীড়াকৌতুক, ইহারা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিল। তাঁহার আর হরিনাম মনে নাই; যেন কোন দুর্দ্দান্ত দস্যু তাঁহার হরি-ভক্তিরূপ অমূল্য রত্নটীকে কাড়িয়া লইয়াছে। দেখিতে দেখিতে একটী নৃত্যপরা অপূর্ব্বরূপশালিনী কিন্নরকন্যা আসিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে এক নিভৃত উপবনে লইয়া গেল। সেখানে এক সুন্দর অট্টালিকায় তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "আপনি এই উদ্যানে চিরকালের মত অবস্থিতি করুন। শত শত দাসদাসী আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবে; যখন যাহা আবশ্যক, ইঙ্গিতমাত্র তাহারা সকলই আনয়ন করিবে। আপনার পুণ্যের সীমা নাই, তাই এমন দেবলোকের উপভোগ্য সুরম্য প্রদেশে স্থান পাইলেন।" এই বলিয়া কন্যা বিদ্যুৎ-বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিবামাত্র এক দল অপ্সর-বালিকা মৃদু মধুর নৃত্যগীতে ত্রিজগতকে মুগ্ধ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক প্রবোধচন্দ্রের গলায় এক অপূর্ব্ব সুচিক্কণ ফুলহার অর্পণ করিল। ক্ষণবিলম্বে আর এক দল বালিকা আসিয়া নানাবিধ সুখাদ্য প্রদান করিয়া গেল। প্রবোধচন্দ্র আত্মহারা ও উন্মত্তবৎ তথায় বসিয়া রহিলেন।

এইরূপে তিন দিবস অতীত হইল। চতুর্থ দিবসের উষা-কালে প্রবোধচন্দ্রের শয্যা পরিত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন মায়ের মত স্নেহবচনে বলি-

তেছেন, "বৎস প্রবোধ! এ শত্রুপুরীতে আপন ইচ্ছায় কেন্ আগমন করিলে? তোমার সাধনভজন সমুদায় যে অকালে পণ্ড হইয়া গেল! বৎস! তুমি হরিনাম ভুলিলে কেন? কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিশ্বপতির মহৈশ্বর্য্য বিস্মৃত হইলে কেন? এই রাক্ষসীরা অচিরাৎ তোমার প্রাণ সংহার করিবে! এই সময় এখান হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা কর। নতুবা শীঘ্রই মহা বিপদ ঘটিবে।" স্বপ্নের মত এই সকল কথা শুনিয়াই তিনি শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং সম্মুখেই দেখিলেন এক প্রাচীনা রমণী সুগম্ভীর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা। তাঁহাকে দেখিলেই মাতৃভাবে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। প্রবোধচন্দ্র তাঁহাকে গললগ্নীকৃতবাসে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আপনি কে?" রমণী উত্তর দিলেন, "আমার নাম শ্রেয়। আমি নিত্যকাল স্বর্গের পথ প্রদর্শিকা। যে ব্যক্তি আমার উপদেশে চলে, তাহার নিশ্চয়ই মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। আমার যেখানে আবির্ভাব হয়, সেখানে কখনই অমঙ্গল ঘটিতে পারে না। বৎস! তুমি বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছ। যে রমণী তোমাকে ভুলাইয়া এখানে আনিয়াছে, সে নিতান্ত পাষাণহৃদয়া। রাক্ষসীর প্রাণেও দয়া আছে, কিন্তু এই প্রেয়ের প্রাণে এক বিন্দুও মমতা নাই। যে ব্যক্তি উহার মায়াজালে বিজড়িত হইয়া এখানে আগমন করে, সে আর সহজে প্রত্যাগমন করিতে পারে না। এখানে একবার আসিলে তাহাকে যাবজ্জীবন লৌহ-কারাগারেই আবদ্ধ থাকিতে হয়। কাহাকেও বা

প্রাণে বিনষ্ট হইতে হব। এই অট্টালিকার নিম্নপ্রদেশে ভূগর্ভে কারাগার অবস্থিত। তোমাকেও সেইখানে যাইতে হইবে। এই সময় এখান হইতে শীঘ্র পলাইবার উপায় অন্বেষণ কর, নতুবা তোমার নিষ্কৃতি নাই।” তাঁহার কথা শুনিয়া প্রবোধের চৈতন্য হইল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি এক মায়াবিনীর মায়াচক্রে পতিত হইয়াছেন। কি করিবেন? ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রেয়ের পদমূলে পড়িয়া বলিলেন, “মা! আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করুন; নতুবা আমার অন্য গতি নাই।”

শ্রেয় বলিলেন, “বৎস! প্রেয় যখন প্রথমে তোমাকে প্রলোভন প্রদর্শন করে, আমিও সেই সময় সেখানে ছিলাম, এবং আমিও আমার যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা তোমাকে বলিয়াছিলাম; কিন্তু প্রেয়ের রূপলাবণ্য দর্শনে এবং কুবেরালয়ের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণে তুমি এতই বিমোহিত হইয়াছিলে যে, আমার কোন কথাই শুনিতে পাও নাই। বৎস! আমার রূপ নাই, যৌবন নাই, ধনসম্পদও নাই; আমি একে কুরূপা, তাহাতে আবার বৃদ্ধা, সেইজন্যই কেহই আমার কথা শুনে না, এবং আমার দিকে চাহিয়াও দেখে না। বোধ হয়, সেই জন্যই তুমিও আমাকে দেখিয়াও দেখিতে পাও নাই। আমাকে না দেখিলে এবং আমার কথা না শুনিলেও আমি কাহাকেও পরিত্যাগ করি না। স্রষ্টা পরমেশ্বর আমাকে মানবমণ্ডলীর চিরসঙ্গিনী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি

তাহাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারি না। সেই কারণেই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে এই শত্রুপুরীর মধ্যেও আগমন করিয়াছি। প্রেয় তোমার যতদূর শত্রু, আমার তাহা অপেক্ষাও অধিক শত্রু। ও চিরকালই আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্য দিবানিশি চেষ্টা করে। কিন্তু আমি সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের শক্তিতে শক্তিমতী বলিয়াই ও এতদিনেও আমার কিছুই করিতে পারে নাই। অদ্য হয়ত তোমার জন্য আমাকেও বিপদে পড়িতে হইবে। যখন তুমি আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তখন প্রাণপণেও আমি তোমার উদ্ধারের উপায় করিব। এক্ষণে অধীর হইও না। আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আগমন কর, আমি একবার প্রেয়ের লৌহকারাগার তোমাকে দেখাইয়া আনি।” এই বলিয়া শ্রেয় প্রবোধচন্দ্রের হস্ত ধারণ পুরঃসর এক অন্ধকারময় গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তথায় প্রবিষ্ট হইয়া প্রবোধচন্দ্র সন্দর্শন করিলেন, উহা লৌহনির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড গৃহ। উহার চারিদিকে শত শত রূপযৌবনশালিনী অপ্সরবালা কৃপাণহস্তে প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। অগণ্য নরনারী উহার মধ্যে লৌহ-শৃঙ্খলে হস্তপদবদ্ধ হইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। তাহাদের সকলেরই দেহ জীর্ণ শীর্ণ ও মলিন; তাহারা সামান্য ছিন্ন কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া কোন রূপে লজ্জা নিবারণ করিতেছে। প্রবোধচন্দ্র সম্মুখস্থ একজন পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওহে ভাই! তুমি পূর্ব্বে কোথায় ছিলে এবং এখানেই বা কতকাল আসিয়াছ?”

পুরুষ উত্তর দিলেন, "আমি একজন রাজা, মধ্যভারতে আমার রাজ্য, আজ প্রায় বিংশতি বৎসর এই কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছি। সাধ করিয়া আপন ইচ্ছায় প্রথমে এখানে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে এমন দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি যে, ইহজীবনে এ কারাবন্ধন হইতে মোচনের আর আশা নাই।" প্রবোধচন্দ্র দ্বিতীয় আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" সে ব্যক্তি লজ্জাবনতমুখে উত্তর দিলেন, "মহাশয়! লোকালয়ে আমার আত্মপরিচয় দান করিতে ইচ্ছা হয় না। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী একজন পণ্ডিত। প্রেমের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এখানে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে আর উদ্ধারের উপায় নাই।" তৃতীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, "আমি একজন বিখ্যাত বীর। মহা মহা সংগ্রামে জয়ী হইয়াও শেষে এই মায়াবিনী প্রেমের কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছি। আমার খড়্গ কত শত বীরের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া অবশেষে সুকোমল রমণীদেহের নিকটে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।" চতুর্থ এক ব্যক্তি গৈরিক বসনধারী তপস্বী, তাঁহার হস্তে হরিনামের মালা, ক্রমাগত হরিনাম জপ করিতেছেন। প্রবোধচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি এখানে কিরূপে বদ্ধ হইলেন?" তিনি বলিলেন, "প্রথমে প্রেমের রূপ দেখিয়া ভুলিলাম, শেষে ধনসম্পদ মণিমাণিক্য দেখিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম; সেই অজ্ঞানা-

বস্থায় জানিনা কিরূপে এখানে বন্দী হইয়াছি।” প্রবোধ-চন্দ্র আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া, শ্রেয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যে দিকে রমণীগণ ছিলেন, তাঁহারা সেইদিকে আসি-লেন। দেখিলেন, রমণীগণ পুরুষগণ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে দীনা হীনা ও কাঙ্গালিনীর মত আবদ্ধা রহিয়াছেন। পুরুষদিগের অপেক্ষা ইহাঁরা সংখ্যাতেও অধিক। তাঁহাদের কাহাকেও কিছু না বলিয়া উভয়ে তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

সমুদায় কারাগার দর্শন করা সমাপ্ত হইলে, তাঁহারা যেমন তথা হইতে বহির্গত হইবেন, অমনই একজন প্রহরী আসিয়া প্রবোধচন্দ্রকে কহিল, “আমাদের কর্ত্রীর আদেশ হইয়াছে, আপনাকে এইখানে যাবজ্জীবন আবদ্ধ থাকিতে হইবে।” প্রবোধচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তোমাদের কর্ত্রী?” প্রহরী উত্তর দিল, “এই কারাগারের অধিকা-রিণী প্রেয়।” প্রবোধচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসিলেন, “তিনি কোথায় আছেন? তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে পারি কি?” প্রহরী উত্তর দিলেন, “তিনি এখন আপন শয়ন-মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছেন, সেখানে কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই।” তখন প্রবোধচন্দ্র শ্রেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা! এখন উপায় কি?” শ্রেয় বলিলেন, “বৎস! নিরুপায়ের উপায় ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমার সমুদায় বিপদ বিদূরিত হইবে।” শ্রেয়ের কথায় তিনি কাতর বচনে

ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু বারম্বার ডাকিয়াও তাঁহার কোনও উত্তর পাইলেন না। তখন রোদন করিতে করিতে তিনি আবার শ্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! এতবার ব্যাকুলভাবে দীনবন্ধুকে ডাকিলাম, কিন্তু একবারও তাঁহার উত্তর পাইলাম না। তবে উপায় কি হইবে?" শ্রেয় উত্তর দিলেন, "বৎস! তুমি আজ কয়েক দিবস হইতে সংসারের রাজ্যে পাপের রাজ্যে আগমন করিয়াছ, এই কয়দিনের মধ্যে একবারও ভগবানের নাম গ্রহণ কর নাই; সেইজন্যই আজ তাঁহার উত্তর পাইতে এত বিলম্ব হইতেছে। তাঁহাকে ভুলিয়া যে মহাপাপ করিয়াছ, অগ্রে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর, তাহার পরে পুণ্যময়ের দর্শন পাইয়া উদ্ধার লাভ করিবে। অদ্য সমস্ত দিন অনাহারে সরোদনে প্রার্থনা কর, তাহা হইলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" এই কথা বলিয়াই শ্রেয় তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

হরিপ্রেমে পাগল সাধক প্রবোধ কিরূপে যে একেবারে হরিনাম ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার। যিনি হরিনামে অত উন্মত্ত ছিলেন, তিনি যে আজ কয়েক দিবস একবারও হরিনাম করেন নাই, ইহা নিতান্তই বিস্ময়কর! সাংসারিক সুখ সাধনের পথে এতই অন্তরায় সাংসারিক সুখের হিরণ্ময় মায়া-কাননে প্রবিষ্ট হইলে, এমনই করিয়াই সাধকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়া থাকে। শুনিয়াছি দেবর্ষি নারদও একবার এইরূপ প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন এ কথা কখনই কল্পনা নহে যে, যিনি শ্রেয়ের অনুসরণ

করেন, তিনি প্রেম ভক্তি বিশ্বাস বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধুগুণ সমুদায় হইতে বঞ্চিত হয়েন। প্রবোধচন্দ্র প্রেয়ের পথে আগমন করিয়াছেন, তাই তাঁহার এই বিপদ সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে শ্রেয়ের কথায় তাঁহার চৈতন্য হওয়ায় তিনি আত্মদুরবস্থা বুঝিয়া তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতেছেন। যখন ঘোর সংসারাসক্তিতে উন্মত্ত হইয়া মানুষ নিতান্ত কষ্টে পতিত হয়, তখন হরিনাম করা ভিন্ন তাহার উদ্ধারের আর উপায় নাই। হরিনামে সংসারাসক্তির জাল ছিন্ন হইয়া যায়। ঘোর বিষয়ীও এই নাম করিয়া মুক্ত বৈরাগী হইয়া থাকে। সংসারের কারা-গারে যে সকল নরনারী হস্তপদবদ্ধ হইয়া কংসের কারায় বসুদেব ও দেবকীর মত পড়িয়া আছেন, তাঁহারা প্রাণপণে হরিনাম সাধন করুন, অচিরাৎ তথা হইতে মুক্ত হইবেন।

প্রবোধ কাতরান্তঃকরণে ক্রমাগত প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে এক গণ্ডূষ জলপান কিম্বা একটিমাত্র ফলও আহার করিলেন না। ধূলায় লুটা ইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রভো! পুণ্যময়! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি না বুঝিয়াই রাক্ষসী প্রেয়ের মায়ায় বিমোহিত হইয়াছিলাম; তজ্জন্যই আজ কারাগারে বন্দী হইয়াছি। দীনবন্ধু! এখন আমার উদ্ধারের উপায় কি? তুমি বিনা এ বিপদে আর যে আমার কেহই নাই। ঠাকুর! তোমার নামের যে, অপরূপ মহিমা! তোমার হরিনাম একবার উচ্চারণ করিলে যে মানবের আর কোনই বিপদ থাকে না। বিপদভঞ্জন! আজ আমি

তোমার নামের মাহাত্ম্য বুঝিব। শুনিয়াছি, তোমার নামে ঘোর ভববন্ধন হইতে জীব মুক্তি লাভ করে, তবে আমার এ সামান্য বন্ধন কি বিদূরিত হইবে না? সঙ্কট হারি! আমি আজ মহা সঙ্কটে পড়িয়াছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর। আর আমি কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিতে চাহি না, আর আমি স্বর্ণপাদপ ও স্বর্ণলতার রূপে মুগ্ধ হইতে বাসনা রাখি না। ভবকাণ্ডারি! এ মহাসমুদ্র হইতে এবার আমায় রক্ষা কর। আমি তোমারই দাস, দেশে দেশে তোমারই নাম গান করিয়া বেড়াইব।" এইরূপে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে দিবাভাগ অতীত হইয়া গেল। সন্ধ্যাকালে তিনি দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ধূলিধূসরিতাঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দীননাথ! দিন যে গেল, এ দীন হীন কাঙ্গালকে এখনও দেখা দিলে না? তবে আমার কি হইবে? হায় হায়! আমি আপন হস্তে বিষম কালকূট পান করিয়া আত্মবিনাশ সাধন করিয়াছি। এ জগতে তোমা বিনা আর কোন্ বৈদ্য বিষহর ঔষধ প্রদান করিবে বল? প্রহ্লাদ নাকি সর্পবিষ পান করিয়াও মরেন নাই; তবে সংসারাসক্তির বিষ পান করিয়া তোমার অভাগা প্রবোধ সত্যসত্যই মরিবে না কি? সর্প অপেক্ষাও আসক্তি অধিকতর বিষময় নাকি? যাহা হইবার হইয়াছে, ঠাকুর! এবার আমায় ক্ষমা কর, আমি আর পাপের রাজ্যে গমন করিব না।" এখনও শ্রীহরি তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার প্রাণ বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। তিনি মাতৃহীন বালকের মত চীৎ-

কাররবে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "মা! আমার করুণাময়ি মা! আমার দীনদয়াময়ি মা! আমার কাঙ্গালজনের মা! তুমি কোথায়? তোমার প্রবোধকে কি একবার দেখিবে না? মা! যদি আজ তোমার দেখা না পাই, তবে নিশ্চয়ই এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। মা! আমার স্নেহময়ি মা! আমার অন্ধের নয়ন! একবার এস। একবার তোমার হতভাগা সন্তানের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দর্শন কর। আমি তোমাকে ভুলিয়া যে মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার শাস্তি নিজহস্তে প্রদান কর। মা! তোমার হাতের প্রহার খাইতে খাইতে প্রাণত্যাগ করা, সে যে আমার স্বর্গলাভ। আহা! আর কি আমি তোমায় দেখিতে পাইব না? আমি কি মহামূল্য স্পর্শমণি হস্তে পাইয়াও পদ দ্বারা ঠেলিলাম? হায়! হায়! আমার কি হইল? ও গো! আমার প্রাণ যে ফেটে গেল! আমার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়াছে। মা—মা—আমি যাই মা—তোমার কোলে যাই মা—ধর মা—ধর—একবার আমায় হাত বাড়াইয়া কোলে লও।" বলিতে বলিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। কারাগারের কয়েদীগণ অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, দশদিক যখন প্রগাঢ় অন্ধকারের কোলে শান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময়ে প্রবোধচন্দ্র যেন শুনিতে পাইলেন, কে একজন অতি মধুর স্বরে গান করিতেছে। গান শুনিয়াই তাঁহার প্রাণটা যেন কেমন নাচিয়া উঠিল। রামদাসজাবদার যখন তাঁহাকে

মৃতবৎ বনের ভিতর ফেলিয়া দিয়াছিল, তখন ঋষিকুমারগণের সঙ্গীত শ্রবণ পূর্ব্বক যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আজ ঠিক সেই ভাবেই মোহিত হইলেন। তিনি নীরবে শুনিলেন, কে গাহিতেছে—

"ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর, আশা কর,
নিরাশ হয়ো না হয়ো না।
তোমার ক্রন্দনধ্বনি, শুনেছেন জননী,
চিরদিন দুঃখ রবে না রবে না।"

প্রবোধ চাহিয়া দেখিলেন, দেবদূত রূপের আভায় কারাগার উজ্জ্বল করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। দর্শনমাত্রেই "জয় মা" "জয় মা" বলিয়া তিনি দেবদূতের পদদ্বয়ে লুটাইয়া বলিলেন, "দেবদূত! এতক্ষণে মা আমার কি আমাকে মনে করেছেন? আজ আমি প্রাতঃকাল হইতে 'মা' 'মা' বলিয়া কত যে কাঁদিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। বল দেবদূত! এতক্ষণে কি এ পাপীর ক্রন্দন স্বর্গে গিয়া পৌঁছিয়াছে? মা কি আমার প্রতি দয়া করেছেন?" দেবদূত উত্তর দিলেন, "প্রবোধ! আর তোমার ভয় নাই। দয়াময়ী বিশ্বমাতা তোমার রোদন শুনিয়াই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'বৎস! তুমি না বুঝিয়া পাপের রাজ্যে আসিয়াছ, সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া আমার নাম গান করা পর্য্যন্তও ভুলিয়া গিয়াছিলে; কিন্তু আমি তোমাকে এক নিমিষের জন্যও ভুলি নাই। এই পাপের দেশেও আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্যভাবে রহিয়াছি। এখানে তুমি যে আহার ও পানীয় পাইতেছ,

সে সমুদায় আমারই হস্তের দান। আমি না দিলে জীব এক কণা তণ্ডুল কি এক বিন্দু জলও পাইতে পারে না। মানুষ ঘোর পাপী হয়, তথাপি আমি তাহার মুখের অন্নজল বন্ধ করি না। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছি বলিয়াই, শ্রেয় তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন; তুমি নিশ্চয় জানিও, আমিই তাঁহাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছিলাম। তোমার আর ভয় নাই, আমি তোমার কাতর ক্রন্দন শুনিয়াছি; শীঘ্রই তোমার এ কারাবন্ধন মোচন করিব। ত্রিভুবনে আমার আশ্রিত জীবকে কেহই কষ্ট দিতে পারে না।' বলিতে বলিতে প্রবোধ! তোমার মা উৎসাহে একেবারে উন্মত্তা হইয়া বলিলেন, 'কি! আমার আশ্রিত সন্তানকে প্রেয় ভুলাইয়া আপন রাজ্যে লইয়া গিয়াছে! মা থাকিতে সন্তান কি প্রাণে মরিবে? কখনই তাহা হইবে না। আমি যে অসুরসংহারিণী, আমি যে দানবদলনী, আমি আজ নিশ্চয়ই এই পাপাসুর-পুরীকে ধ্বংস করিব। প্রেয় কি আমার প্রতাপ জানে না? যুগে যুগে সে আমার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আসিতেছে, তথাপি তাহার লজ্জা হইল না।' এই বলিয়া তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবদূত! তুমি এখনই গিয়া আমার কোলের ছেলে প্রবোধকে সান্ত্বনা কর। আহা! দুধের গোপাল আমার বিপদে পড়িয়া 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতেছে, তুমি গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লও; আমি সদলে শীঘ্রই যাইতেছি।' তাহার পরে তিনি বিবেকবৈরাগ্য প্রভৃতিকে বলিলেন, 'বিবেক! বৈরাগ্য! তোমরা এখনই যুদ্ধসজ্জায়

সজ্জিত হও, এখনই তোমাদিগকে কুবেরালয়ে যাইতে হইবে। সেখানে প্রবোধ বড়ই বিপদগ্রস্ত, এখনই তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে।' তাঁহার এই কথা শুনিয়া সমুদায় দেবদল মাতিয়া উঠিয়াছেন। স্বর্গলোকে মহা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে; যিনি যেখানে আছেন, তিনিই যুদ্ধবেশে সাজিতেছেন; এখনই তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইবেন। তোমার আর কোনও ভয় নাই; তুমি চক্ষের জল মুছিয়া উপবেশন কর।"

দেবদূত নীরব হইলেন, এবং প্রবোধচন্দ্র তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে ক্রমাগত রোদন করিতে লাগিলেন। ঘোর বিপদে বারম্বার ডাকিয়া ভক্ত যখন ভক্তবৎসলের উত্তর পান, তখন তাঁহার বলিবার আর কোন কথাই থাকে না, কেবল মুগ্ধ হইয়া তিনি ক্রমাগত রোদন করেন। দেবদূত বলিলেন, "প্রবোধ! তুমি কাঁদিতেছ কেন? চক্ষের জল মুছিয়া হাস্য কর, তোমার দুঃখের নিশা অবসান হইয়াছে।" প্রবোধ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিলেন—

"মা নাম আর ভুল্‌ব না।
মা বলে ডাকিলে আমার জুড়ায় রসনা।
ধূলাতে পড়িয়ে কাঁদি　　গড়াগড়ি দিয়ে,
কোথা মা বলে—
মা যে দ্রুত আসিয়ে,　　ধূলা ঝাড়িয়ে দিয়ে,
কোলে লয়ে মধুর স্বরে করেন সান্ত্বনা;

স্তনদুগ্ধ দিয়ে, রাখিবেন ভুলাইয়ে,
মায়ের কোলে থাক্‌লে ছেলে আরত কাঁদে না।”
গাহিতে গাহিতে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িলেন।

এমন সময়ে শঙ্খ ঘণ্টা তুরী ভেরী বাজাইয়া দেবসেনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিবেক ও বৈরাগ্য, এই দুই জন সেনাপতি, ইহাঁদের প্রত্যেকের অধীনে অগণ্য হরি-সেনা, প্রেয়ের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের কল-রবে প্রবোধ চৈতন্য লাভ করিলেন। বিবেক আসিয়া তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, “প্রবোধ! অদ্য রাত্রি প্রভাতেই তোমাকে প্রেয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। ইহাকে সবংশে ধ্বংস না করিলে কোনমতেই তোমার পরিত্রাণ নাই। মা দানবদলনী মহাশক্তি ভগবতী আমাদিগকে লইয়া তোমার সাহায্যার্থ আসিয়াছেন।” প্রবোধ কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৈ আমার মা কৈ? কৈ আমার দানবদলনী কৈ? বিবেক! তুমি শীঘ্র আমাকে মায়ের কাছে লইয়া চল।” বিবেক বলিলেন, “নিরাকারা জননী এই হরিসেনাগণের প্রত্যেকের ভিতরে অবতীর্ণা। এই যে অগণ্য যোদ্ধা দেখিতেছ, ইঁহারা তোমার মাতৃশক্তি বিনা আর কিছুই নহে। তুমি স্বতন্ত্রাকারে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না; আমাদিগের ভিতরেই তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে।” প্রবোধ আবার বলিলেন, “আমি ত পূর্ব্বে কতবার তাঁহাকে দেখিয়াছি, তবে অদ্য দেখিতে পাইব না কেন?” বিবেক উত্তর দিলেন,

"এখন পাপের রাজ্যে আসিয়াছ, পাপবংশ সমূলে বিনষ্ট না হইলে তাঁহার আর প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবে না।" এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে রাত্রি অবসান হইয়া আসিল। পূর্ব্বাকাশে বালারুণের দিব্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া অন্ধকারে বিপন্ন জীবদিগকে আশ্বাস প্রদান করিল। বিপদাপন্ন প্রবোধও সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পাইবার আশায় আনন্দিত হইলেন। বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "প্রবোধ! আর বিলম্ব করিবার কিছুই আবশ্যক নাই, বিবেক ও আমি, দুইজন সেনাপতি, তোমার দুই পার্শ্বে অবস্থিতি পূর্ব্বক যুদ্ধ করিব, তোমার কিছুমাত্রও ভয় নাই, তুমি শীঘ্রই যুদ্ধ আরম্ভ কর।" তাঁহার বাক্যাবসানে প্রবোধ বলিলেন, "তবে আপনারা সৈন্যবিন্যাস করুন, এখনই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। দক্ষিণে বিবেক এবং বামে বৈরাগ্য সসৈন্যে দণ্ডায়মান হইলেন। সৈন্যগণ মহোল্লাসে রণবাদ্য আরম্ভ করিলেন।

কারাগারের মধ্যে এই সমুদায় ব্যাপার হইতেছে, সুতরাং প্রেয় ইহার কিছুই জানেন না। একজন প্রহরী দ্রুতপদে তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করিবার জন্য প্রস্থান করিল। দূতমুখে তিনি ঘটনা অবগত হইয়াই, ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, "মুহূর্ত্তেকের ভিতর সৈন্যগণ সজ্জিত হউক, এবং কারামধ্যেই দেবসেনাগণকে বিনষ্ট করা হউক।" আদেশ পাইবামাত্রই সভ্যতা, বিলাস প্রভৃতিকে সেনাপতি করিয়া সহস্র সহস্র মঞ্জুবালা মনমুগ্ধকারিণী বেশবিন্যাস করিয়া যুদ্ধসজ্জায়

সজ্জিতা হইল। এবং অতি অল্প সময় মধ্যেই তাহারা দেব-সেনার সম্মুখীনা হইয়া বূাহ রচনা করিল। যখন উভয় পক্ষীয় সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল, তখন তাহা-দিগকে দেখিতে এক অতি অপূর্ব্ব শোভা হইল। দেব-সেনার যেরূপ রূপলাবণ্য, যক্ষসেনারও তেমনই রূপলাবণ্য। একদিকে শত শত দেবশিশু অসামান্য দেবসৌন্দর্য্যে বিভূষিত, এবং অপর দিকে শত শত কিন্নরবালা অলৌকিক রূপরাশিতে সমুদ্ভাসিতা। দেবতাদিগের কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ স্কন্ধদেশে ও পৃষ্ঠে সুশোভিত, এবং কিন্নরকুমারীদিগের অবেণীবদ্ধ চাঁচর চিকুরজাল পশ্চাদ্ভাগে আলুলায়িত। বিবেকবৈরাগ্য প্রভৃতির মুখশ্রী অপার সৌন্দর্য্যভরা, এবং সভ্যতাবিলাস প্রভৃতির মুখশোভা অসীম লাবণ্যমাখা। দেবতাদিগের কণ্ঠে মন্দারমালা, এবং অসুরদিগের গলে মালতীহার। দেবহস্তে আত্মজ্ঞানের অসি, এবং যক্ষকরে প্রলোভনের খড়্গ। অমরদলের পরিধানে স্বার্থত্যাগের সুপবিত্র বসন, এবং কিন্নরকুলের পরিধানে আসক্তির নীলাম্বর। দেবসেনার দিকে তাকাইলেও প্রাণ মুগ্ধ হয়, এবং যক্ষসেনার পানে চাহিলেও মন মোহিত হয়। প্রবোধ-চন্দ্র একবার হরিসেনার দিকে তাকান, আর বার কিন্নর-সেনার দিকে চাহেন। তিনি বিবেকের মুখের দিকে তাকা-ইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবেক! এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য-ময়ী বালিকাদিগকে কোন্ প্রাণে বধ করিব? আহা! তাহা হইলে যে কুবেরালয়ের সুষমাময় অপার শ্রী একেবারে অন্ধকারে মিশাইয়া যাইবে?" বিবেকের উত্তর দান করি-

খার পূর্ব্বেই শ্রেয় কোথা হইতে বিদ্যুৎবেগে আসিয়া তাঁহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রবোধ! তোমার এখনও চৈতন্য হইল না? ঐ রূপের মধ্যেই ত কালকূট লুক্কায়িত আছে, ঐ প্রস্ফুটিতা কুসুমমালার মধ্যেই ত বিষধর ফণী শয়িত আছে! উহাদিগের সৌন্দর্য্যে কি ভুলিতে আছে? ঐরূপ রূপ দেখাইয়াই ত প্রেয় তোমাকে এই কারাগারে বদ্ধ করিয়াছে। এখন আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না। শীঘ্র শীঘ্রই উহাদিগকে বধ কর।" এই কথা বলিয়াই তিনি নিজে সেনাদলের অগ্রে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে অগ্রে দাঁড়াইতে দর্শন করিয়া প্রেয়ও নিজ দলের অগ্রে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবতাদিগেরও যেরূপ পরাক্রম, অসুরদিগেরও সেইরূপ বিক্রম। সহজে কেহই কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিলেন না। বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতি সময়ে সময়ে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন; কিন্তু সভ্যতাবিলাস প্রভৃতি একবারও পরি-শ্রান্ত হইল না। ক্রমে পাপের অস্ত্রাঘাতে পুণ্যের সৈন্য দুই একটী করিয়া অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু হরিপ্রেম মৃতসঞ্জীবনী নামামৃতের কলস লইয়া তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন; যেমন কেহ অচেতন হয়েন, অমনই তিনি তাঁহাকে সেই অমৃতসিঞ্চনে সচেতন করেন। সুতরাং দেবসেনার কাহারও প্রাণের আশঙ্কা রহিল না। সমস্ত দিন অবিরাম যুদ্ধের পরে বৈরাগ্য গিয়া বিলাসের মস্তকে সজোরে এক খড়্গাঘাত করিলেন। বিলাস তাহাতেই

অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। খবিলাসের পতন দেখিয়া কিন্নরকুমারীগণ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। এ দিকে সন্ধ্যার গাঢ় আঁধারে কারাগৃহ অন্ধকারময় হইল। এমন সময়ে যুদ্ধ করা অসম্ভব দেখিয়া, প্রেয় শ্রেয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রেয়! অদ্য যুদ্ধ বন্ধ থাকুক, কল্য প্রভাতে আবার আরম্ভ হইবে।" শ্রেয় বলিলেন, "রে পাপিয়সি! তাহা কখনই হইবে না। আমরা অদ্য রজনীতেই তোরে সসৈন্যে বিনাশ করিয়া ধর্ম্মের মান রক্ষা করিব।" অন্ধকারে হরিসেনাদলের প্রত্যেকের অঙ্গ হইতে এক অপূর্ব্ব দিব্যালোকচ্ছটার প্রকাশ হইতে লাগিল, তাহাতে তাঁহাদিগের যুদ্ধ করিবার কিছুই অসুবিধা হইল না। এদিকে যক্ষসেনা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না; তাহারা আপনাপনিই শত্রুবোধে পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। এমন সময়ে দেবসেনা তাহাদিগের ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহাদিগকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। তখন তাহারা কাতরস্বরে চীৎকার করিতে করিতে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! অজেয় হরিসৈন্যগণ তাহাদিগকে এক একটী করিয়া ধরিতে লাগিলেন এবং খড়্গাঘাতে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই সমুদায় কিন্নরকিন্নরী সবংশে বিনষ্ট হইয়া গেল। তাহাদিগের রুধিরস্রোতে কারাগার এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ রম্য উপবন প্লাবিত হইল। শ্রেয় কারাবরুদ্ধ বন্দীগণকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দিলেন; তাহারা দুই হস্ত তুলিয়া ধর্ম্মরাজ শ্রীহরিকে

ধন্তবাদ দিতে দিতে প্রস্থান করিল। তৎপরে দেবসেনা তথা হইতে বাহিরে আসিয়া কুবেরালয়ের সমুদায় সৌন্দর্য্য— স্বর্ণতরু, কনকলতা, হিরণ্ময় অট্টালিকা প্রভৃতি অগ্নিযোগে দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। অঞ্জনানন্দন যেরূপ স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলেন, হরিসেনাও সেইরূপ সুবর্ণের কুবেরপুরী দগ্ধ করিলেন। যেখানে ইতিপূর্ব্বে শোভার ভাণ্ডার বিদ্যমান ছিল, সেইখানেই এখন মহা শ্মশান ক্ষেত্র বিস্তৃত হইল। দেখিতে দেখিতে প্রভাতগগণের অপরূপ প্রভা প্রকাশিত হইল। দেবসেনা প্রবোধকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, প্রবোধও তাঁহাদিগকে বারম্বার নমস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া পুণ্যময়ের জয়োচ্চারণ করিতে করিতে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। কেবল শ্রেয় প্রবোধকে কহিলেন, "বৎস! তোমার শত্রুকুল সমূলে ধ্বংস হইয়াছে; এক্ষণে আনন্দমনে শ্রীহরির জয়োচ্চারণ কর।"

স্ফুটন্ত গোলাপের মত যক্ষবালাদিগের বিনাশে এবং স্বর্ণপুরীর ভস্মাবশেষ দর্শনে প্রবোধের প্রাণে শান্তি ছিল না। তিনি শুষ্কমুখে বলিলেন, "মা! প্রাণটা বড়ই অস্থির হইয়াছে। আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। আমার জন্যই এই কুবেরালয় ভস্মীভূত হইল। আহা! সে অপরূপ শোভা এখনও যে নয়নের উপরে বিশদ রূপে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।" শ্রেয় বুঝিলেন প্রবোধের প্রাণের অভ্যন্তরে এখনও প্রবল আসক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন তিনি তাঁহার চক্ষুদ্বয়ে হস্তমার্জ্জন পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ

দেখি প্রবোধ! অমরনিকেতনের কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য!" প্রবোধচন্দ্র চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "তাইত! এ যে সপ্তস্বর্গের শোভার একত্র সমাবেশ! কুবেরালয়ের সৌন্দর্য্য ইহার এক কোণেও লাগে না। মা! আমি ঐখানে যাইব!" শ্রেয় বলিলেন, "বৎস! অগ্রে কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে সাধনভজন রূপ সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ কর, তাহার পরে এ দেহ অবসানে চিন্ময় ভাগবতী তনু ধারণ পূর্ব্বক ঐ দিব্যলোকে গমন করিয়া নিত্যকাল সুখে বাস করিবে। আর স্বপ্নেও এই কিন্নরপুরীর বিষয় চিন্তা করিও না।" প্রবোধচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! কুবেরালয়ের এ সমস্ত ঘটনা কি জন্য হইল?" শ্রেয় উত্তর দিলেন, "বৎস! প্রেয় বাহ্যিক রূপলাবণ্য প্রদর্শন করিয়া নরনারীকে পাপের রাজ্যে লইয়া যায়। কুবেরালয় এই পাপরাজ্য। প্রথমে সৌন্দর্য্য দেখাইয়া ভুলাইয়া শেষে জন্মের মত ঐ কারাগারে বদ্ধ করে। সংসারই এই কারাগার এবং রাজাপ্রজা, বিদ্বানমূর্খ, নরনারী সকলেই বন্দী। মুক্তিদাতা ভগবানের আশীর্ব্বাদে তুমি মুক্তি লাভ করিলে। গুরুদেব যোগানন্দ তোমাকে যে সোণার হরিণের কথা বলিয়াছিলেন, ইহাই সেই স্বর্ণমৃগ। তুমি ইহার রূপে ভুলিয়াছিলে, তাই অত বিপদে পড়িয়াছিলে। গুরুবাক্য তোমার মনে ছিল না। এক্ষণে চল, তোমার বন্ধু শ্যামদাস তোমা হারা হইয়া বনের মধ্যে ক্রন্দন করিতেছে।" এই বলিয়া তিনি প্রবোধের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

শ্রেয় ও প্রেয়ের অপূর্ব্ব যুদ্ধ বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিবার সাধ থাকিলেও শক্তি এবং সময়ে কুলাইল না। সাধক যখন আপনার প্রাণের ভিতরে এই দেবাসুরের সংগ্রাম দর্শন করেন, তখন তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন, ইহা কিরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার। অতএব, পাঠক পাঠিকা-দিগের নিকটে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা আপন আপন জীবনে এই মহাকুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম দর্শন করিবেন। বাহিরে ইহার কিছুই নাই। কুবেরালয়ের সমুদায় ব্যাপার, যাহা এই পরিচ্ছেদে বিবৃত হইল, তাহা সমুদায়ই আধ্যাত্মিক।

বৃন্দাবনে।

যেখান হইতে প্রেয় প্রবোধচন্দ্রকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরে আসিয়া শ্রেয় কহিলেন, "প্রবোধ! ঐ দেখ, তোমার সঙ্গী শিলাতলে পড়িয়া তোমার বিচ্ছেদে রোদন করিতেছে। তুমি এক্ষণে উহাকে সান্ত্বনা কর, আমি বিদায় গ্রহণ করি।" এই বলিয়াই তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। প্রবোধ দূর হইতে সন্দর্শন করিলেন, শ্যামদাস প্রস্তরের উপরে শয়ন করিয়া অধো-মুখে ক্রন্দন করিতেছেন। প্রবোধ একেবারে নিকটে না আসিয়া কিয়দ্দূরে এক বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রবণ করিলেন, শ্যামদাস কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতে-ছেন, "প্রভো! শ্রীহরি! আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি আজিও শেষ হয় নাই? হায়! প্রাণের বন্ধুকে ভুলে

কৃপা পাইয়া মনে করিয়াছিলাম, আমি সহজেই উদ্ধার লাভ করিব। কেন না, প্রবোধচন্দ্র এক সময়ে আমার বন্ধু ছিলেন, সুতরাং এক্ষণে আমাকে তিনি জ্ঞান ও ভক্তি বিতরণ করিতে কখনই বিমুখ হইবেন না; যেহেতু, তিনি আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। কিন্তু হরি! এখন আমার সে আশালতা সমূলে ছিন্ন হইল। প্রবোধ! প্রবোধ! ভাই আমার! তুমি আজ কোথায়? তুমি কি আমাকে সত্যসত্যই পরিত্যাগ করিয়াছ? আমি তোমার কাছে যত অপরাধ করিয়াছি, আজীবন তোমার চরণ সেবা করিয়া তাহার কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু হায়! আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তুমি আমাকে এই বনের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গেলে। বেশ করিয়াছ, মহাপাপীর উচিত শাস্তিই হইয়াছে। কিন্তু প্রবোধ! মনে এক তিলও বিশ্বাস করিও না যে, তোমার সঙ্গহারা হইয়াও অভাগা শ্যামদাস জীবিত থাকিবে। আমি এই হিমাদ্রিশিখরে এই শিলাতলেই অনশনে এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" তাঁহার এই সকল হৃদয়দ্রবকারী কথা শ্রবণে প্রবোধের চক্ষে দুই এক বিন্দু জল পড়িল। তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া দ্রুতপদে আগমন পূর্ব্বক শ্যামদাসের পদমূলে পতিত হইয়া বাষ্পগদগদকণ্ঠে কহিলেন, "শ্যামদাস! ভাই! তোমার অভাগা বন্ধু প্রবোধের অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি এত দিনে বুঝিলাম, তুমি যথার্থই আমার প্রাণের বন্ধু। ভাই! মনে করিও না যে, আমি তোমাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া-

ছিলাম। আমি এক মায়াবিনী রাক্ষসীর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া মহা বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে পুণ্যময় শ্রীহরির করুণায় সে ঘোর বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। ভাই! প্রাণ ভরিয়া বল, 'জয় হরির জয়'।" উভয়ে মুক্ত-কণ্ঠে দুবাহু তুলিয়া বলিলেন, "জয় হরির জয।" তাঁহা-দিগের হরিধ্বনিতে যেন সমুদায় পর্ব্বত প্রকম্পিত হইল। শ্যামদাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রভো! কিরূপে কি হইল, তৎসমুদয শ্র বণ করিতে বড়ই বাসনা হইয়াছে।" প্রবোধচন্দ্র আদ্যোপান্ত সমুদায় ঘটনা বিবৃত করিলে শ্যামদাস বলিলেন, "আহা প্রভো! শ্রীহরির অপরূপ লীলামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া প্রাণে বড়ই আশার সঞ্চার হইল। এক্ষণে চলুন, এ বিজন অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও গমন করি।" প্রবোধচন্দ্র বলিলেন, "ভয কি ভাই! ভয়াপহারী হরিনাম যতক্ষণ আমাদের মুখে থাকিবে, ততক্ষণ শমনও আমাদিগকে দেখিলে ভয়ে কম্পিত হইবে। তবে যে কুবেরপুরে বিপদে পড়িয়াছিলাম, সে কেবল হরিনামের শক্তি পরীক্ষার জন্য। যদি আবারও কোন বিপদে পড়ি, নিশ্চয় জানিও, তাহাতে হরিনামের যে কত গুণ, তাহাই জানা যাইবে। আমাদিগের যে বিপদ, সে আমাদিগকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য নহে, কিন্তু হরিনামের আশ্চর্য্য মহীয়সী শক্তি জগতের সম্মুখে প্রদ-র্শন করিবার জন্য। প্রহ্লাদের যে অত বিপদ ঘটিয়াছিল, সে প্রহ্লাদকে কষ্ট দিবার জন্য নহে, কিন্তু শ্রীহরি যে প্রহ্লাদকে কত ভালবাসিতেন, তাহাই ঘোষণা করিবার

জন্য। শ্যামদাস! ইহা যেন তোমার ধ্রুব বিশ্বাস থাকে যে, ঈশ্বরের অনুগত দাসের কোথাও বিপদ নাই।"

তাঁহারা তথা হইতে ক্রমে ক্রমে কাশ্মীর, অমৃতসর, লাহোর, মুলতান, কর্ণাল ও দিল্লী পরিদর্শন পূর্ব্বক বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনধামে প্রবেশ করিবামাত্রই প্রবোধচন্দ্র ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ভাগবতে যে বৃন্দাবনের বর্ণনা আছে, সে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে মহা পাষণ্ডও বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু, সে প্রেমরসের আধারভূমি, সে প্রকৃতি পুরুষের নিভৃত লীলাকুঞ্জ, প্রেমিক সাধক ভিন্ন আর কেহই দর্শন করিতে পারেন না। জয়দেবের সেই 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীর,' সেই 'মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীর,' এবং সেই 'অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপ' বাহিরে নহে। হে উপাসক! যদি কখন ধ্যানস্থ হইয়া তোমার প্রাণের প্রিয় দেবতার লীলাবিহার দর্শন করিয়া থাক, তবে তুমিই বৃন্দাবনধাম দর্শন করিয়াছ। যেখানে শ্রীহরি নৃত্য করেন, সেই স্থানই শ্রীবৃন্দাবন, যেখানে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসের ক্রীড়াভবন, সেই স্থানেই শ্রীবৃন্দাবন, এবং যেখানে প্রেমোন্মত্ত সরল স্বভাব যোগী ঋষি ও মুনিগণ প্রেমানন্দে সেই প্রেমময়ের নামামৃত পান করেন, সেই স্থানেই শ্রীবৃন্দাবন। বৃন্দাবন কেবলমাত্র যমুনাপুলিনেই নহে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থলেই উহা পরিব্যাপ্ত। এ দেখ, সূর্য্যলোকে, চন্দ্রলোকে, গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি লোকলোকান্তরে, সর্ব্বত্রই আনন্দময়

দেবতার শ্রীবৃন্দাবন। ঐ দেখ, প্রত্যেক পক্ষীর সঙ্গীতে ও নৃত্যে, প্রত্যেক জন্তুর ক্রিয়াকলাপে, এবং প্রত্যেক নরনারীর মুখশোভায় শ্রীবৃন্দাবন প্রকাশিত। ঐ দেখ, প্রতি পুষ্পে, প্রতি পত্রে, প্রতি নদীহিল্লোলে, প্রতি দূর্ব্বা-দলে এবং প্রতি শিশিরকণিকায় উপাসকের নয়নারাম শ্রীবৃন্দাবন বিভাসিত হইতেছে। প্রবোধচন্দ্র বাহিরের বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াই, ভাবে অন্তরের বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি ভাগবতের বৃন্দাবনের অনুপম সৌন্দর্য্য-রসে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন। তিনি সন্দর্শন করিলেন, লীলাময় শ্রীহরি ভূমণ্ডলের প্রতি পরমাণুতেই দিবানিশি ক্রীড়া করিতেছেন। দর্শনমাত্রেই প্রেমানন্দে বিগলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে প্রেমময়! এত দিন তোমার নাম গান এবং তোমার লীলাবিহার দর্শন করিয়াও তোমার প্রতি একবিন্দুও প্রেম সঞ্চারিত হইল না কেন? প্রাণসখে! এখনও তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ হয় কেন? আহা! মনে বড় সাধ হইয়াছে যে, অবিচ্ছেদে তোমার মুখ-চন্দ্রের সৌন্দর্য্য সুধা পান করিয়া মন-চকো-রকে চিরকালের মত কৃতকৃতার্থ করিব। ঠাকুর! বলি ও ঠাকুর! তত পালাও কেন বলত? আমার হৃদয়াকাশে চিরকালের মত উদিত থাকিতে তোমার কি কষ্ট হয়? আমার হৃদয় কি আজিও পাষাণবৎ কঠিন আছে? শুনি-য়াছি হরি, তোমার পাদপদ্ম স্পর্শে পাষাণও বিগলিত হয়; তবে আমার পাষাণহৃদয়কে একবার স্পর্শ করিয়া কোমল কর না কেন? আমি আর কিছুই চাহি না, ইন্দ্রত্বও চাহি না,

কুবেরত্বও চাহি না, বৈকুণ্ঠলোকও চাহি না, ধ্রুবলোকও চাহি না; আমি কেবল তোমারই প্রেমরসে চিরদিনের মত মজিয়া থাকিতে চাহি।"

এই বলিয়া প্রবোধচন্দ্র ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেলেন। মুখে বাক্য নাই, শরীরে স্পন্দন নাই, প্রস্তরখণ্ডের মত বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন, "ঐ শুন! ঐ শুন। ঐ বাঁশীর রব! যে বাঁশীর রবে মজিয়া ভক্ত-গোপবালাকুল কুলমানে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, শ্যামদাস! শুন, শুন, ঐ সেই বাঁশরী আবার বাজিতেছে! কে বলে শ্রীহরির লীলা শেষ হইয়াছে? কে বলে ব্রজধাম অন্ধকার হইয়াছে? আয়, আয়, আয় জগৎবাসি! আয়, দেখে যা এখানে কেমন নিত্য বৃন্দাবন প্রকাশিত রহিয়াছে। ঐ দেখ, কত যোগী, কত ঋষি। ঐ যে আমার গৌর নাচিতেছেন। ঐ যে আমার নারদ গান করিতেছেন! বা! আমি ছিলাম পৃথিবীতে, স্বর্গে এলাম কি রূপে? আমি নিশ্চয়ই কোন যাদুকরের যাদুতে মজিয়াছি। ঐ যে, ঐ যে, সেই বাঁশী আবার বাজিতেছে! ঐ যে নিজে শ্রীহরি বাঁশী বাজাইয়া নিজ নাম গান করিতেছেন! আহা!

"হরির মুখে হরিধ্বনি শুনে প্রাণ উথলিল,
বাঁশীর গানে প্রাণপাখী চিদাকাশে উড়ে গেল।"

ওগো, তোমরা বল না, আমি এখন কি করি? ভূমে পড়িয়া গড়াগড়ি দিব কি? আমার হৃদয়ে প্রেমসমুদ্র যে উথলিয়া উঠিয়াছে! হৃদয়ে যে আর প্রেম ধরিতেছে না।

আমি এখন যাই কোথায়? পাগল হয়ে যাইব নাকি? কেন এমন হইল? নিশ্চয়ই আমাকে কে পাগল করিয়াছে। ওপাশে ও কে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে? হরি বুঝি? তুমি ত বেশ মজার লোক? আমাকে কি মন্ত্রে পাগল করিয়া আপনি এক পাশে দাঁড়াইয়া হাসিতেছ? ঐ জন্যই ত তোমার বাড়ী কেউ আসে না, এবং তোমার নামও কেউ করে না। যে তোমার নাম করে, তাকে পাগল করে দেও বলিয়া, কেউ আর তোমাকে ডাকে না। তা এখন যা করিবার তা করিয়াছ, আর এক পাশে দাঁড়াইয়া কেন? আমার বুকে এস, আমি এখন তোমাকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া বহুদিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।"

বলিতে বলিতে তিনি এদিকে ওদিকে ছুটিতে লাগিলেন। শ্যামদাস কত চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রবোধচন্দ্র পাগল হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হরি! হরি! আবার লুকাচুরি কর কেন? তুমি যে ছেলে মানুষেরও অধিক হইলে দেখিতেছি। তোমার এ ছেলেখেলায় আমার যে প্রাণ যায়। যায় প্রাণ যাউক, তোমাকে আজ ধরিবই ধরিব।" এইরূপ বলিতে বলিতে এবং ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। শ্যামদাস তাঁহার শুশ্রূষায় রত হইলেন। অনেকক্ষণ পরে ভক্তের নেশা ছুটিল। ঝরঝরধারে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যামদাসের গলা জড়াইয়া বলিলেন, "বল ভাই শ্যামদাস! ভগবান তোমাকে কিরূপে তাঁহার প্রেম-কারাগারে বন্দী করিয়াছেন।

আমাকে ত তিনি একেবারেই পাগল করিয়াছেন, এখন বল, তুমি কেমন করিয়া এ নব নটবরের চাতুরীজালে ধরা পড়িয়াছ।" শ্যামদাস না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল স্তরে অশ্রু সম্বরণ পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রভো! আপনি ত জানেন, হরি কেমন করিয়া আপনাকে বশীভূত করিয়াছেন। আপনাকে যেরূপে মজাইয়াছেন, আমাকেও সেইরূপে ভুলাইয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে কত শত্রুতা করিয়াছি, বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে কত প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছি। কিন্তু, প্রভো, তিনি কেবল আমাকে ভালবাসিয়াই পরাস্ত করিয়াছেন। প্রভো! মায়ের কাছে ছেলের লাফালাফি কয় দিন থাকে?" বলিয়াই চীৎকাররবে কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল বিলম্বে একটু শান্তভাব পরিগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

"প্রভো! দুরন্ত জগাইমাধাই যেমন সাধু নিত্যানন্দকে প্রহার করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, রামদাস এবং আমিও তেমনই আপনাকে প্রহার করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি। আমি শুনিয়াছি, রামদাসেরও মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে। আমাকে এক সাধু পুরুষ বলিয়াছিলেন, ভগবান পাপ দিয়া পাপ বিনষ্ট করেন। এতদিনে তাহা আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম। প্রভো! রামদাস এবং আমি যেদিনে আপনাকে মৃতবৎ করিয়া বনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আসি, সেই দিনে সন্ধ্যার সময় হঠাৎ আমার প্রাণটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাহা করি-

তাহাই যেন বিষময় বলিয়া বোধ হইল। আহার করিতে যাইলাম, আহার ভাল লাগিল না। শয়ন করিলাম, শয্যা যেন কণ্টকময় মনে হইতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিদ্রার লেশমাত্রও আসিল না। রজনীর শেষভাগে একটু তন্দ্রা আসিল। তদবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন কে একজন যমদুতের মত বিকটকায পুরুষ প্রকাণ্ড গদা হস্তে লইয়া আমাব মস্তক চূর্ণ করিতেছে। তাহাকে কত অনুনয় বিনয় করিলাম, সে কিছুতেই শুনিল না; অনবরত মস্তক চূর্ণ করিতে লাগিল। রক্তে ভূমি সিক্ত হইয়া গেল। প্রাণে বড়ই যাতনা হইল; যাতনা সহিতে না পারিয়া ব্যাকুলভাবে চীৎকার কবিয়া উঠিলাম। হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইল, শয্যাব উপরে বসিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলাম। কেন প্রাণে এত যাতনা হইতেছে, তাহা জানিতে পারিলাম না। মনে কি রোগ হইয়াছে, তাহা ধরিতে পারিলাম না। কেন কাঁদিতেছি, কে কাঁদাইতেছে, তাহাব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমে যন্ত্রণা অসহ্য হইতে লাগিল; শয্যায় পডিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সান্ত্বনা করে এমন লোক কেহই নিকটে ছিল না। সে ঘোর রাত্রিতে আমার সেই রোদন কেহ শুনিয়াছিল কি না জানি না! বোধ হয়, দীনবন্ধু শ্রীহরি লুকাইয়া লুকাইয়া তাহা শুনিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি আজ আমাকে শান্তি দান করিয়াছেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। আমার রোগের যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বাড়ীর কাহাকেও

কিছু না বলিয়া গঙ্গার জলে আসিয়া পড়িলাম; মনে করিলাম, যদি প্রাণটা শীতল হয়। কিন্তু শত সহস্র গঙ্গার সুস্নিগ্ধ জলধারাতেও কাহারও প্রাণের অগ্নি কখনও নির্ব্বাণ হয় না। আমার অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে লাগিল। গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া শুষ্কপথে এক কদম্বরৃক্ষমূলে আসিয়া উপবেশন করিলাম। হঠাৎ বৃক্ষের শাখা হইতে একটী সুপক্ক আম্র ফল পতিত হইল। কদম্ববৃক্ষ হইতে আম্র পড়িতে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। উপরের দিকে তাকাইয়া দেখি, একটী কাক বসিয়া আছে। ভাবিলাম, এই কাকটীই চঞ্চুপুটে এই আম্র আনিয়াছিল। তখন ভগবানকে দেখিবার শক্তি ছিল না, সুতরাং কাককে দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইলাম। পিপাসা হইয়াছিল, সেই সুমিষ্ট ফলটী ভোজন করিয়া করপুটে গঙ্গাজল পান করিলাম। বেলা যত অধিক হইতে লাগিল, যাতনাও তত বাড়িতে লাগিল। কেন এত যাতনা হইতেছে, তখনও বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ যেন কোথা হইতে কাহার কথা শুনিতে পাইলাম। চমকিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিলাম, কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কেবল দেখিলাম, দূর প্রান্তরে কৃষকগণ লাঙ্গল চষিতেছে এবং রাখালবালকদল গরু চরাইতেছে। তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। হঠাৎ অতি নিকটে আর একবার সেইরূপ কথা শুনিতে পাইলাম। এবার প্রাণে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হইল। অদূরে শ্মশানঘাট, তবে নিশ্চয়ই এই গাছে ভূত আছে। ইহা ভূতের

কথা ভিন্ন আর কাহারও কথা নহে। সর্ব্বনাশ! আমাকে কি তবে কল্য হইতে ভূতে ধরিয়াছে? ভূত বলিল, 'শ্যামদাস! আমি ভূত নহি, আমি দেবদূত। তোর মত নারকী জগতে আর নাই। বন্ধু প্রবোধকে প্রাণে মারিয়া টাকা কাড়িয়া লইলি? এই কি তোর বন্ধুত্ব? নরাধম! তুই যে অমানুষিক কার্য্য করিয়াছিস্, তাহার প্রতিফল দিবার জন্য ঐ দেখ্ যমদূতেরা আসিতেছে।' শেষে দেখিলাম, দেব-দূত আমারই প্রাণের ভিতর হইতে কথা বলিতেছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। এতক্ষণে বুঝিলাম, আমার এ মৃত্যুযন্ত্রণা কেন হইতেছে। বন্ধু প্রবোধচন্দ্রকে প্রাণে বিনষ্ট করিয়াছি, তাহার জন্যই এত কষ্ট। সেই পাপের জন্যই এত যন্ত্রণা। মনে করিলাম এ যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। দূতকে ডাকিয়া কাতরে বলিলাম, 'দেব! আমি মহা পাপাচরণ করিয়াছি। আমার পক্ষে মৃত্যুই উপযুক্ত শাস্তি; অতএব আপনি আমাকে প্রাণে বিনষ্ট করিয়া আমার সমুদায় কষ্টের শেষ করুন।' তিনি উত্তর দিলেন, 'রে অজ্ঞান! তুই কি মনে করিয়াছিস্, দেহান্তেই তোর পাপের শাস্তি ফুরাইয়া যাইবে? তাহা কখনই হয় না। অনেক পাপী পৃথিবীতে আত্মপাপের জন্য বিন্দুমাত্রও শাস্তি পায় না। এমন কি, তাহারা যে মহাপাতকী, তাহা পর্য্যন্তও জানিতে পারে না। তাই বলিয়াই কি তাহাদের পাপের কোনও শাস্তি হইবে না? তুই জীবিতই থাক্, আর প্রাণত্যাগই কর্, যে পাপ করিয়াছিস্, তাহার জন্য যমদূতের প্রহার

সহ্য করিতেই হইবে।' ইহার পরে কত ডাকিলাম, আর দেব-দূতের কোনই উত্তর পাইলাম না।

"এতক্ষণে মনে হইল, আমার মত পাপী আর জগতে নাই। এই মুহূর্ত্ত যে আমার জীবনের কি ঘোর পরিবর্ত্তন সাধন করিল, তাহা আমি আর প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। এই মুহূর্ত্তই আমার নবজীবন লাভের প্রথম মুহূর্ত্ত। পাপী যে মুহূর্ত্ত বুঝিতে পারে যে, সে পাপী, সেই মুহূর্ত্তই তাহার মহেন্দ্রক্ষণ। আমার জীবনে এমন মুহূর্ত্ত আর কখনও ঘটে নাই। যখনই বুঝিলাম, আমি পাপী, তখনই আমার পরিত্রাণের বীজ রোপিত হইল। যাতনা পূর্ব্বের অপেক্ষা দ্বিগুণ বাড়িল। আমি পাপী, আমার ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইয়াছে, তবে আমি দাঁড়াই কোথায়? কে যেন আমার পৃষ্ঠে চড়াৎ চড়াৎ করিয়া বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া দেখি, সূর্য্য অগ্নিমূর্ত্তি, প্রান্তরের দিকে চাহিয়া দেখি, প্রান্তর মরিচীকাময়। সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধবিদগ্ধ হইতে লাগিল। একবার বৃক্ষতলে দাঁড়াইলাম, ছায়া যেন শুষ্ক বলিয়া জ্ঞান হইল। আবার ছুটিতে লাগিলাম। শেষে মনে করিলাম, এ পাপীকে উদ্ধার করিতে বোধ হয় আর কেহই নাই; তবে আর কাহার কাছে যাইব? কোন্ চিকিৎসক এ মহারোগের ঔষধ বিধান করিবেন? শুনিয়াছি, মা গঙ্গা সকলেরই পাপাগ্নি নির্ব্বাণ করেন, যত কেন পাপী হউক না, গঙ্গাজলে অবগাহন করিলে

তাহার সমুদায় পাপই মোচন হইয়া যায়। আহা! কত লোকে ঊর্দ্ধশ্বাসে শত যোজন পথ হাঁটিয়া ইঁহার নিকটে আগমন করেন। এমন কি, নিতান্ত নরাধমের একখানি অস্থিও যদি ইঁহার গর্ভে পতিত হয়, তাহাতেও সে না কি মুক্তিলাভ করে। সেই পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা, সেই মুক্তিপ্রদায়িনী জননী, সম্মুখে; তবে আমার ভয় কি? ঘোর বিপদের সময় শিশু সন্তান সম্মুখে মাতাকে দর্শন করিলে, যেমন দ্রুতপদে তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, আমিও তেমনই মহাপাপ হইতে উদ্ধারের আশায় দ্রুতপদে গঙ্গার গর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। যেমন পড়িলাম, অমনই অতল জলে তলাইয়া গেলাম। ক্রমে জ্ঞান লোপ হইয়া গেল; শেষে যে কি হইল, তাহা জানিতে পারিলাম না।

"পরে যখন চেতনা হইল, তখন দেখিলাম, এক সামান্য তৃণকুটীরপ্রাঙ্গণে শয়ন করিয়া আছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি কোথায়?' কে একজন বলিল, 'ভয় নাই, তুমি একজন বৈষ্ণবের আশ্রমে রহিয়াছ। এ গ্রামের নাম নবদ্বীপ।' ক্রমে ক্রমে আমার শরীর সুস্থ হইতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে মনের যাতনা পূর্ব্ববৎ আরম্ভ হইল। গঙ্গাজলে ডুবিয়াও পাপের অগ্নি নির্ব্বাণ হইল না। এখনও মধ্যে মধ্যে দেব-দূত আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ওরে পাপি! তুই পাপের জন্য নরকে যাইবি।' বৈষ্ণব ঠাকুর বড়ই দয়ালু; তিনি আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা! নৌকাডুবি হইয়া বুঝি নদীগর্ভে পড়িয়াছিলে?' তদুত্তরে

আমি তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমুদায় ঘটনা বিবৃত করিলে, তিনি একটী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'বুঝিয়াছি, কাঠের নৌকা নয়, কিন্তু আত্মারূপ নৌকা ডুবিয়াছে। তা বাবা! ভয় কি? তাহারও ত উপায় আছে।' আমি আশ্বাসিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সে কি উপায়?' তিনি বলিলেন, 'হরিনাম। যে নামে জগাইমাধাই তরিয়া গিয়াছিলেন।' আমার প্রাণে হরিনামের ঢেউ এই প্রথম লাগিল। নাম শুনিবামাত্রই প্রাণটা একটু শীতল হইল। বাবাজী আনন্দ-লহরী বাজাইয়া গাহিলেন,—'হরিনাম বিনা আর কি ধন আছে সংসারে।' আমার প্রাণটা একেবারে গলিয়া গেল। নাম শুনিতে শুনিতে প্রাণে একটু শান্তি পাইলাম। রোগের মুখে ঔষধ পড়িল। বাবাজীর চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলাম, 'আমার উপায় করুন।' তিনি বলিলেন, 'বাবা! তুমি যখন পাপের যন্ত্রণা বুঝিতে পারিয়াছ, তখন তোমার আর ভয় নাই। তুমি আমার আশ্রমে থাকিয়া দিবানিশি হরিনাম সাধন কর, তাহা হইলেই সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইবে।' আমি তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া হরিনাম সাধন করিতে লাগিলাম। তিনি ভিক্ষা করিতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভিক্ষা করিতাম। ক্রমাগত নামসাধন করিতে করিতে রোগ অনেকটা উপশম হইয়া আসিল। আমাদের কুটীরে মধ্যে মধ্যে কত সাধু কত ভক্ত আসিতেন। তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত তত্ত্বসুধা পান করিতে করিতে আমি কৃতার্থ হইতে লাগিলাম। নাম শুনিতে শুনিতে নামের উপরে আমার এত শ্রদ্ধার উদয় হইল যে,

এক এক দিন ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রার কথা পর্য্যন্তও ভুলিয়া যাইতাম। বাবাজী এক দিন বলিলেন, 'বাবা! তুমি অচিরাৎ সিদ্ধকাম হইবে। কেন না, নামের উপরে তোমার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা হইয়াছে দেখিতেছি। গীতাতে আছে—শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।

বাবাজী যেমন ভক্ত তেমনই শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁহার মুখে নিত্য নূতন নূতন তত্ত্বকথা শুনিয়া আমি চরিতার্থ হইতে লাগিলাম। বুঝিলাম, ভগবান সত্যসত্যই পতিতপাবন; তাই তিনি আমাকে এমন সাধুসঙ্গ মিলাইয়া দিয়াছেন। সাধুসঙ্গে, ভগবান যে কি বস্তু, ক্রমে তাহা চিনিতে লাগিলাম। এতদিনে স্পর্শমণির আদর বুঝিতে পারিলাম। মনে করিলাম, এ জীবনে এ সাধুসঙ্গ আর পরিত্যাগ করিব না। এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল। এক দিন বাবাজীর আদেশ লইয়া গৃহে যাইলাম। পিতামাতা আমাকে দেখিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা মনে করিয়াছিলাম, তুমি আর জীবিত নাই।' বহুদিনের পরে আমাকে পাইয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। বিশেষতঃ, আমার হরিভক্তিতে তাঁহারা সমধিক প্রফুল্ল হইলেন। তাঁহাদিগের এবং অন্যান্য লোকের মুখে আপনার জীবনপরিবর্ত্তনের কথা শ্রবণ করিয়া আশ্বাসিত হইলাম। মনে করিলাম, শ্রীহরি আমাদের দুই জনকেই তবে পরিত্রাণ দিবেন। কয়েক দিবস গৃহে থাকিয়া অনেক কষ্টে পিতামাতার চরণে বিদায় লইয়া আবার নবদ্বীপে আসিলাম। তাহার কিছুকাল পরেই শুনিলাম, রামদাস

না কি এক ডাকাইতের দল করিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে ডাকাইতি করিয়া বেড়াইত। শেষে এক স্থানে ডাকাইতি করিতে গিয়া ধরা পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইয়াছে। সেই অবধি সে নাকি সন্ন্যাসী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ইহার কিছু দিন পরেই আপনি নবদ্বীপধামে দ্বিতীয় নবদ্বীপচন্দ্রের ন্যায় উদয় হইলেন। আমার উপদেষ্টা বাবাজী বলিলেন, 'শ্যামদাস! তুমি এই প্রেমিক পুরুষের পশ্চাতে পশ্চাতে যাও, তোমার মঙ্গল হইবে।' আমি আপনাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম, এবং সেই সময়েই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, 'যে হস্তে আপনাকে প্রহার করিয়াছিলাম, সেই হস্তেই চিরকাল আপনার চরণ-সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব।' সুতরাং বাবাজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। শেষে আপনার সহিত পরিচয় হইল।"

শ্যামদাসের পরিত্রাণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রবোধ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আহা ভাই! আমরা ঘোর পাপী হইয়াই ধন্য হইয়াছি। অত পাপ করিয়াছিলাম বলিয়াই, পুণ্যময় ভগবান অত করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন। শ্যামদাস! আমার পরিত্রাণের কথাও তুমি শুনিয়াছ। ভগবান কি হইতে কি করেন, তাহার কিছুই বুঝা যায় না। তোমরা আমাকে প্রহার করিয়া টাকা কাড়িয়া লইলে; এই ঘটনা হইতে কি চমৎকার মুক্তিপ্রদ ব্যাপারই না সংঘটিত হইল! বল, প্রাণ ভরিয়া বল, 'জয় পতিতপাবনের জয়'।" উভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন,

"জয় পতিতপাবনের জয়।" প্রবোধচন্দ্র আবার সোৎসাহে বলিলেন, "ভাই! যাহারা বলে, পাপীর আর পরিত্রাণ নাই, তাহারা শ্রীহরির লীলার একবিন্দুও জানে না। সামান্য তৃণকণাকেও স্নেহময় ঈশ্বর কত যত্নে রক্ষা করেন, আর এমন অমূল্যরত্ন মানবাত্মাকে কি তিনি রক্ষা করিবেন না? আমরাই তাঁহাকে ছাড়ি, তিনি আমাদের ছাড়েন না; আমরাই তাঁহাকে ভুলি, তিনি আমাদের ভুলেন না।" বলিতে বলিতে গাহিলেন—

"কলুষ সাধনে, যাহার হৃদয়,
সদাই মগন রয়,
কি গুণে ভুলিয়া পুণ্যময় হরি,
ডাক সখা বলে তায়।
যে জন ধনমদে মত্ত, সদাই উন্মত্ত,
গর্ব্বে গর্ব্বিত রয়;
তার কি গুণ স্মরি, পুণ্যময় হরি,
ডাক সখা বলে তায়।
বুঝিনু এখন, পতিতপাবন,
তোমার প্রেমের রীত;
যেজন চাহেনা তোমারে, চাও তুমি তারে,
সাধিয়ে কর সুহৃদ।"

ব্যাঘ্রমুখে।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।)

লোকে বলিয়া থাকে, ভগবানের অবতরণ পৃথিবীতে আর হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যখন পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, শ্রীহরি তখনই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এখন আর তিনি অবতীর্ণ হন না। কলিযুগের শেষে আবার আসিবেন। কেন না, শাস্ত্রে আছে—পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।—অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন, সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। অধিকাংশ লোকে ঈশ্বরের এই যুগাবতার লইয়াই সন্তুষ্ট। আমরা কিন্তু তাঁহার নিত্যাবতারের পক্ষপাতী। আমরা বলি, প্রজাপতি যিনি, বিশ্বের পালক যিনি, তিনি বিশ্বে প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান না থাকিলে, বিশ্ব চলে না। আমরা দেখিতেছি, শ্রীহরি আমাদের সম্মুখে নিত্য অবতীর্ণ। আমাদের এ ব্রহ্মদর্শনকে কেহ ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। কেন না, আমরা যে বিশেষ মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন করিতেছি, তাহা নহে। চৈতন্যশক্তিরূপেই আমরা তাঁহাকে নিত্য দর্শন করিয়া থাকি। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ব্রহ্ম যদি নিত্য অবতীর্ণ, তবে গীতার উপরোক্ত উক্তি কি ভ্রমসঙ্কুল? এ কথার উত্তর আমরা এখানে দিব না, যদি সুবিধা হয়, স্থানান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ

সকলে জানিয়া রাখুন, গীতার উক্তি মিথ্যা নহে। এখানে আমরা যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা এই যে, যিনি চরাচর বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য ইহার মধ্যে প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান আছেন। এ কথা কেহ কি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারেন যে, 'ভগবান পৃথিবীতে আর নাই?' বোধ হয় এ কথায় নাস্তিক ভিন্ন জগতের আর কেহই সায় দিবেন না। সকলেই বলিবেন, ভগবান পৃথিবীতে নিত্যকালই বর্ত্তমান আছেন। কেননা, বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ব্যাকুলান্তঃকরণে ডাকিলে, তিনি বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, মনে মনে পাপ করিলেও তিনি তাহার শাস্তি প্রদান করেন, এবং আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে বাধা দিলেও তিনি তাঁহার প্রকৃতির কার্য্য আপন ইচ্ছা মত চালাইতেছেন। জগতের নিত্যসজীবতা দেখিয়াই আমরা তাঁহাকে নিত্যকালই জীবন্ত ভাবে দর্শন করি। শ্রীমদ্ভাগবতে যে হরিলীলা বর্ণিত হইয়াছে, মূর্খেরা বুঝিয়া থাকে, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানী ও প্রেমিক লোকেরা উক্ত হরিলীলাকে প্রতিনিয়ত চক্ষের সম্মুখে দর্শন করিয়া ধন্য হয়েন। কি আশ্চর্য্য! জগত চলিতেছে, জগদীশ্বর চলিতেছেন না? আমরা একথা কিছুতেই মান্য করি না। আমরা দেখি, আমাদের ভগবান নিত্যকালই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। আমরা যেখানে যাই, তিনি সেখানে। আমরা কখনও একাকী হইতে পারি না। ঘোর বিপদের দিনে আমরা দেখি, আমাদের ভগবান, বিপদভঞ্জন রূপে আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া

আছেন। রোগের সময় দেখি, শ্রীহরিই আমাদের রোগ বিনাশের জন্য চিকিৎসক বেশে আমাদিগের পর্ণকুটীরের দ্বারে সমুপস্থিত। প্রহ্লাদ ডাকিলে হরি আসেন, তুমি আমি ডাকিলে আসেন না, আমরা এমন হরি মানি না। ভগবান ধ্রুবকে দর্শন দিয়া তাঁহার সমুদায় মনোবেদনা বিদূরিত করেন, তোমাকে আমাকে দেখা দেন না, এবং তোমার আমার মনোবেদনাও দূর করেন না, ইহা নিতান্তই অসম্ভব। তিনি প্রহ্লাদের যেমন আমাদেরও তেমনই সখা, তিনি ধ্রুবের যেমন আমাদেরও তেমনই শ্রীহরি। যে কেহ তাঁহাকে ডাকে, করুণাময় ভগবান তাহাকেই দর্শন দেন, যে কেহ কাঁদে, দীনদয়াল হরি তাহারই চক্ষের জল মুছাইয়া দেন। এই পুস্তক যাঁহারা পাঠ করিতেছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করুন যে, গ্রন্থকার নিজ জীবনের পরীক্ষিত সত্য সকলই ইহাতে লিখিতেছেন। কবিতা বা কল্পনার লেশ মাত্রও ইহাতে নাই।

প্রবোধচন্দ্র ও শ্যামদাস বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া রাজপুতানার অন্তর্গত বহু জনপদ ও নগর পরিদর্শন পূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিন্ধ্যগিরির অপূর্ব্ব মনোহারিণী সৌন্দর্য্য বর্ণনার বিষয় নহে, কেবল দুনয়ন ভরিয়া দর্শন করিবার জিনিস! তাঁহারা কিছু দিন তথায় যোগধ্যানে অতিবাহিত করিলেন। এখানে এক গুহার ভিতর তাঁহারা একজন মহাযোগীর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তিনি ইহাঁদিগকে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মশ্রবণ বিষয়ে অনেক উপদেশ দান করিলেন। সাধনপ্রভাবে প্রবোধ-

চন্দ্র দিবানিশি শ্রীহরিকে সন্দর্শন এবং তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে মহাযোগীর চরণে বিদায় লইয়া তাঁহারা পর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যেস্থানে পর্ব্বত ছাড়িয়া সমতল প্রদেশে অবতরণ করিতে হয়, সেই স্থানে এক প্রশস্ত রাজপথ পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে। প্রবোধচন্দ্র এবং শ্যামদাস পর্ব্বতশিখর হইতে এই রাজপথের যেস্থানে অবতরণ করিলেন, সেইখানে একটী অনতি-উচ্চ গণ্ডশৈল থাকায় পথটী বক্রভাবাক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহারা যেমন এই বক্রপথের উপরে উপস্থিত হইলেন, অমনই দেখিলেন, সম্মুখেই একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শয়ন করিয়া আছে। দেখিয়াই তাঁহারা চমকিয়া উঠিলেন, এবং ব্যাঘ্রও গাঝাড়া দিয়া দণ্ডায়মান হইল। একটু পূর্ব্বেই দিনমণি অস্তাচল গুহাশায়ী হইয়াছিলেন, সুতরাং সুযোগ পাইয়া অন্ধকার আসিয়া সমুদয় পর্ব্বতপ্রদেশ আপনার করায়ত্ত করিয়াছিল। সেই সন্ধ্যার আঁধারে তাঁহারা কোথায় গিয়া যে আত্মগোপন করিবেন, তাহাও দেখিতে পাইলেন না। মহা বিপদ! এবার বুঝি নিশ্চয়ই প্রাণ যায়! শ্যামদাস অস্থির হইয়া বলিলেন, "প্রভো! জীবনের আর আশা নাই। এই শেষ সময়ে একবার হরিনাম করুন, জন্মের মত শুনিয়া যাই।" প্রবোধচন্দ্রও অধীর, ভয়ে তাঁহারও প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে। কত চেষ্টা করিলেন, শ্রীহরিকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন না। ভয়ে তাঁহারা এমনই জড়ভাবাক্রান্ত হইলেন যে, আর এক পদও অগ্রে কি পশ্চাতে অগ্রসর হইতে

পারিলেন না। ঘোর বিপদে মহা সাধকও হতবুদ্ধি হইয়া যান, সেইজন্যই প্রবোধের মত সাধকও আজ এত ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহার নামে ভবভয় বিদূরিত হয়, সেই বিঘ্নবিনাশন ভবাভয়হারী শ্রীহরিকে ডাকিলেন, কিন্তু তাঁহার কোনই উত্তর পাইলেন না। এদিকে ব্যাঘ্রও তাঁহাদিগের উপরে পড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে শ্যামদাস অচেতনবৎ ভূমে পতিত হইলেন, এবং প্রবোধচন্দ্র জানু পাতিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি ডাকিলেন, "ঠাকুর! ও ঠাকুর! তুমি কোথায়? তোমার দাসদ্বয় কি সত্যসত্যই আজ প্রাণে মরিবে? তুমি ধ্রুবকে গহন কাননে ব্যাঘ্রমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে, দাস ডানিয়েলকে সিংহের কবালগ্রাস হইতে বাঁচাইয়াছিলে, তবে আমাদিগকে কি এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে না? বিপদভঞ্জন! বিপদে পড়িয়া প্রহ্লাদ তোমাকে ডাকিয়াছিলেন, তুমি প্রহ্লাদকে পরিত্যাগ করিতে পার নাই, তবে আজ আমাদিগকে কি বলিয়া পরিত্যাগ করিবে? সঙ্কটহারি! যে তোমাকে ডাকে, তুমি তাহাকেই মহাসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া থাক, তবে আজ কি তোমার দাসেরা সত্যসত্যই উদ্ধার লাভ করিবে না? তবে তোমার নামে যে কলঙ্ক হইবে? তবে আর ত তোমার নাম কেহই লইবে না? যে নামে বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া যায় না, সে নাম লইয়া কি হইবে? আমরা প্রাণে মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার নাম যে কলঙ্ক-সাগরে ডুবিবে, ইহাতেই আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।" বলিতে বলিতে তিনি

কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িলেন।

শরণাগতবৎসল শ্রীহরি কি আশ্রিত জনের ব্যাকুল প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন? যে বলে, প্রার্থনা করিয়াও ভগবানের উত্তর পাওয়া যায় না, সে প্রার্থনা করিতেই জানে না। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, প্রাণের প্রার্থনা হইলে, ভগবানের কোনও সাধ্য নাই যে, তাহাকে উপেক্ষা করেন। ভগবান ত স্বাধীন নহেন যে, তিনি আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিবেন। ভক্তজন তাঁহাকে আপনার অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন। ভক্ত যেখান হইতে যখনই ডাকেন, আমরি ভগবানকে তথনই সেখানে ছুটিয়া যাইতে হয়। ভক্ত বিপদে পড়িলে, ভগবান অস্থির হইয়া উঠেন। ভক্তের ধন বল নাই, বুদ্ধি বল নাই; ভক্তের বল কেবল দুর্ব্বলের বল শ্রীহরি। তাই ভক্ত কিছুতেই ভীত হয়েন না। কেন না, তিনি জানেন, আমি যখনই ভগবানকে ডাকিব, ভগবান তখনই উপস্থিত হইবেন। তুমি আমি অবিশ্বাসী, তাই রাত্রিদিন কেঁদে মরি; নতুবা, এখন পরম দেবতার অধীনে বাস করিলে কাহাকেও কাঁদিতে হয় না। প্রবোধ শ্রীহরির প্রিয়ভক্ত হইয়াও দুর্ব্বলতা বশতঃ ভীত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন; বিপদভঞ্জনের নিকট সে প্রার্থনা গিয়া পৌছিল। তিনি আর কি স্থির থাকিতে পারেন? ভক্ত বিপদে পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে, ভক্তবৎসলের প্রাণ আর কি ধৈর্য্যধারণ করিতে পারে? সন্তানের বিপদে মাতা যেমন উন্মাদিনী হয়েন, অকপট প্রিয়তম বন্ধুর বিপদে

বন্ধু যেমন উন্মত্ত হয়েন, স্নেহময়ী জগজ্জননী প্রবোধের বিপদে তেমনই পাগলিনী হইলেন, প্রাণের প্রিয়ধন ভক্ত-সখা শ্রীহরি, প্রবোধের বিপদে তেমনই উন্মত্ত হইলেন। এস হে জগত্বাসি! একবার দেখে যাও, আমার ভক্ত-বৎসল ভগবান কিরূপে নিজ আশ্রিত ভক্তকে মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করেন! তোমরা আমার ঠাকুরকে মান না, বিপদের সময় তাঁহাকে ডাক না, ডাকিলেও বল, ভগবানের উপরে নির্ভর করিয়া থাকিলে কিছুতেই চলে না। তোমরা নাস্তিক, তোমাদের কাছে আমি কোন্ কথা বলিব জানি না। আজ একবার স্বচক্ষে দেখে যাও, আমার বিপদভঞ্জন দেবতা প্রবোধকে রক্ষা' করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিলেন। আজ আমি যাহা বলিতেছি, ইহার এক বিন্দুও কল্পনা নহে। সত্যসত্যই, সত্য ঘটনা আজ আমি জগতের সম্মুখে বিবৃত করিতেছি। আমার 'হরিলীলা' জীবন্ত হরিলীলা। ইহা বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত পাঠ করিলে জীবের নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইবে'।

অবিশ্বাসি! একবার দেখ, চাহিয়া দেখ, ঐ দেখ, আমার ভগবান আসিয়া প্রবোধচন্দ্রকে কোলে করিয়া বসিলেন। এ নির্জ্জন গিরিপ্রান্তে আর কেহই নাই, কেবল ঐ দেখ একজন অভয়প্রদাতা দেবতা কোথা হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ঠাকুর! তুমি কি পাহাড়ের গুহায় লুকাইয়া ছিলে? প্রবোধ ডাকিতে না ডাকিতে এত শীঘ্রই কোথা হইতে আসিলে? বিজ্ঞানবিৎ তোমার এ গতি নির্ণয় করিতে চিরপরাস্ত। তুমি যদি এত নিকটেই থাক,

তবে আমাকে দেখা না দিয়া এত কাঁদাও কেন? যাহা হউক, তোমার চরিত্র বুঝা ভার। প্রবোধের আর ভয় নাই, তিনি এখন মাতৃক্রোড়ে শয়িত রহিয়াছেন। তিনি কিন্তু জানেন না যে, তাঁহার দেবতা আসিয়া তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছেন। অভয়দায়িনী দেবী শ্যামদাসকে কোলে লইতে যে ভুলিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি মা হইয়া দুইটী পুত্রকে দুই ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। হঠাৎ প্রবোধের চৈতন্য সঞ্চার হইল; তিনি চমকিয়া দর্শন করিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ শোণিতে আপ্লুত হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহার কারণ এ জগতে কোন মস্তিষ্ক নির্ণয় করিতে পারে না। যাহা মানবের স্বপ্নেও আসে না, তাহাই আজ প্রবোধের চক্ষের সম্মুখে। ও গো! তোমাদের আবার বলিতেছি, এ ঘটনা কল্পনা নহে, ভক্তকে লইয়া ভক্তসখা ভগবান এইরূপ লীলাই করিয়া থাকেন। প্রবোধচন্দ্র দেখিলেন, একদল বর্ষাধারী অশ্বারোহী ভারতীয় সৈন্য ব্যাঘ্রের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং একেবারে তিন চারি জন অশ্বের উপর হইতে বর্ষা দ্বারা ব্যাঘ্রকে বিদ্ধ করিয়াছে। ব্যাঘ্র রক্তাক্ত কলেবরে ভূতলে লুটাইতেছে। বিদ্ধ করিবার সময় উষ্ণ রক্তধারা চলকিয়া প্রবোধের গাত্রে লাগিয়াছে। প্রবোধচন্দ্র ঠাকুরের এই অভাবনীয় আবির্ভাব দেখিয়া আনন্দে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সৈন্যগণ অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অচেতন প্রবোধচন্দ্র এবং শ্যামদাসের চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক মৃত শার্দ্দূলদেহ অশ্বোপরি লইয়া বরদা-

রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল। প্রবোধচন্দ্র পাগল হইয়া বারম্বার সৈন্যদিগকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীহরি আজ এই সৈন্যদলের ভিতর দিয়াই তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য খেলা দেখিয়া প্রবোধ একে-বারে পাগল হইয়া গেলেন। তিনি হঠাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আবার হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন। "জয় প্রভো!" "জয় প্রভো!" বলিয়া বারম্বার ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। রক্তধারার উপরে ধূলিসংযোগে সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল। পর্ব্বত-মূলে বসিয়া একতারা বাজাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিলেন,—

"তুমি দয়াময় পতিতপাবন।
ভক্তের জীবন ধন;
ও হে হৃদয়বিহারি, অন্তর্যামী হরি,
বাঞ্ছাকল্পতরু, দারিদ্র্যভঞ্জন।
হয়ে নিরুপায় যেজন তোমারে,
ডাকে প্রাণপণে ব্যাকুল অন্তরে,
দাও পদাশ্রয়, অভয় তাহারে
লও কোলে করে জননী যেমন।"

সমস্ত রজনী এই গান গাহিতে গাহিতে অতিবাহিত হইয়া গেল

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু।

চল পাঠক, বহুকালের পরে একবার শান্তিপুরে রমেশচন্দ্র ও কমলিনীকে দর্শন করিয়া আসি। প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই এতদিন ঘুরিতেছি, তাঁহাদের সংবাদ কিছুই লওয়া হয় নাই। তাঁহারা প্রাণে আছেন কি না, তাহাও জানি না। যাহা হউক, ধীরে ধীরে এস, একবার রমেশচন্দ্রের শয়নকক্ষে প্রবেশ করি। ঐ দেখ, রমেশচন্দ্র পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছেন। দেহযষ্টি নিতান্ত ক্ষীণ, মুখবর্ণ বিবর্ণ, মস্তকে এক অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন, তাহা হইতে অনর্গল রক্ত বিনিঃসৃত হইতেছে। নীরব হইয়া মহাযোগীর ন্যায় নিমীলিতচক্ষে নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। পদপ্রান্তে সাধ্বী কমলিনী উপবেশন পূর্ব্বক নীরবে ক্রমাগত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। চিকিৎসক আসিয়া মস্তকের ক্ষতস্থানে ঔষধপ্রয়োগ এবং নানাবিধ উপায়ে রোগীকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রতিবাসীবর্গের অনেকেই অশ্রুপূর্ণ নয়নে রোগীর পরিচর্য্যা এবং অন্যান্য তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। পরিচারক-পরিচারিকাগণ ভয়চকিতভাবে এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে। হঠাৎ একজন পরিচারিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওগো! বাবার আমার কি হইল গো! আমার প্রাণ যে ফেটে যায় গো! আমি কি করি কোথায় যাই গো!"

একজন পরিচারক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো! এমন 'বাবা' আর পাইব না। ছেলে বেলায় আমার বাবা মরিয়া গিয়াছেন, আমি এতকাল ইঁহার নিকটে থাকিয়া সে বাবাকে ভুলিয়া গিয়াছি। আমার মত হতভাগা আর নাই, তাই এমন 'বাবাকে' পাইয়াও হারাইতে বসিয়াছি।" আর একজন পরিচারিকা কমলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ও মা! মা আমার! তোর দশা কি হবে মা? আমি এ প্রাণ ধরিয়া তোর দুর্দ্দশা দেখিতে পারিব না মা! আয় মা! দুই মায়ে ঝিয়ে বাবা প্রাণে থাকিতে থাকিতে গঙ্গার জলে ডুবে মরি।" কমলিনী এতক্ষণ মরমের কান্না মরমেই কাঁদিতেছিলেন, কেবলমাত্র দুনয়নে উষ্ণ জলধারার স্রোতঃ প্রবলবেগে বহিতেছিল; এক্ষণে আর তিনি হৃদয়-বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি চীৎকাররবে কাঁদিয়া উঠিলেন, "বাবা প্রবোধ! তুমি কি এখনও জানিতে পার নাই যে, তোমার কি সর্ব্বনাশের দিন উপস্থিত হইয়াছে। তুমি যাঁহাকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিতে, যাঁহার মুখ একটু মলিন দেখিলে তোমার প্রাণ ফাটিয়া যাইত, যাঁহার পদধূলি না লইয়া তুমি গৃহের বাহির হইতে না, আজ বুঝি তোমার সেই দেবতাকে, সেই প্রিয় পিতাকে, সেই পরম সম্বলকে দুরন্ত যম আসিয়া হরণ করিয়া লইয়া যায়! ও গো, আমার কি হইল? আমার প্রাণ যে কেমন করিতেছে!" একটু শান্তভাব পরিগ্রহ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাতঃকালে প্রবোধকে

আনিতে লোক গিয়াছে, এখনও আসিল না কেন?" জনৈক পরিচারিকা উত্তর দিল, "অনেক দূরের পথ বলিয়াই দেরি হইতেছে, শীঘ্রই আসিবেন।

কিয়ৎকাল পরে রমেশচন্দ্র ধীরে ধীরে নেত্রযুগল উন্মীলিত করিয়া অতি মৃদুস্বরে গম্ভীর ভাবে কমলিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "কমলিনি! সাধ্বি! সতি! বোধ হয়, আমার দুঃখের গাঢ় রজনী এতদিনে চিরপ্রসন্ন সুখের উজ্জ্বল আলোকে পরিণত হইল! এতকাল এই জরামৃত্যু-রোগশোকময় সংসারকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া বুঝিতাম, কিন্তু, আজ আমার জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে কি অলৌকিক লাবণ্যময় অমৃতধাম প্রকাশিত হইয়াছে! এখানে পদে পদে এত যাতনা, কিন্তু ওখানে নিত্য আনন্দ। একবার কোনও রূপে ঐ দেববাঞ্ছিত লোকে যাইতে পারিলে, মানব অমর হয়। এতদিন তোমাদিগকেই আপনার ভাবিয়া মোহে অন্ধ হইয়া ছিলাম, আজ যেন তোমাদিগকে তত আপনার বলিয়া বোধ হইতেছে না। একটু পরেই আমি যখন তোমাদিগকে ফেলিয়া এখান হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিব, তখন আর তোমরা আমার সত্যসত্যই আপনার কিরূপে? হায়! হায়! অজ্ঞানতা-বশতঃই এতকাল পরমধনের মর্ম্ম না বুঝিয়া আমি অসার ধনের জন্য কতই না কষ্ট স্বীকার করিয়াছি। প্রবোধরে! বাপ আমার! তুমি আমার পুত্র নও, বাস্তবিক তুমি আমার গুরু। তোমার ভাব, ভক্তি ও বৈরাগ্য দেখিয়াই তোমার পাষণ্ড পিতা শেষ দশায় তোমার প্রাণের ঠাকুরের মর্ম্ম একটু একটু

বুঝিতে পারিয়াছিল। তোমা হেন সাধু পুত্র যাই আমি লাভ করিয়াছিলাম, তাই আমার এই অন্তিমকালে এত আনন্দ হইল। নতুবা মহানারকীর মত আজ আমায় হাহাকার করিতে করিতে সংসার হইতে বিদায় লইতে হইত। বাপ! তোমার শ্রীহরি ধন্য! যেহেতু তিনি তোমার জন্য আমাকেও উদ্ধার করিলেন। সুনীতি যেমন ধ্রুবের কল্যাণে ভুবনরঞ্জন শ্রীহরির দর্শন পাইয়াছিলেন, আজ আমিও সেইরূপ তোমার কল্যাণে অমৃতময় পরম পুরুষের দর্শন পাইলাম। আহা! আর আমার প্রাণে এক-বিন্দুও মৃত্যুভয় নাই। আমি এখন বেশ শান্তিতে অবস্থান করিতেছি। কমলিনি! আমাকে একবার হরিনাম শুনাও।” কমলিনীর কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কোনও কথা কহিবার শক্তি নাই; প্রাণ ফাটিয়া রক্তবর্ণ চক্ষু দিয়া অজস্র-ধারে অশ্রুবর্ষণ হইতেছে। তিনি কথা কহিবার কত চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই পারিলেন না। একজন পরি-চারিকা বস্ত্রাঞ্চলে শোকাশ্রু মার্জ্জন করিয়া কহিল, “বাবা! একটু শান্ত হইয়া থাক, এখন কথা কহিলে পীড়া বাড়িবার সম্ভাবনা। তোমার এ ব্যারাম নিশ্চয়ই সারিয়া যাইবে।”

রমেশ। আহা মা! তোমার কোমল প্রাণে তুমি আমার আরোগ্যই কামনা করিতেছ। আহা! তোমাদের মত পরিচারিকা জগতে কাহারও হয় না। তোমরা আমাকে স্নেহময়ী জননীর মতই যত্ন করিয়া আসিয়াছ। কিন্তু মা! আজ তোমাদের ভালবাসার ‘বাবা’ সত্যসত্যই তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিল। তোমরা আর আমাকে

বৃথা আশ্বাস দিয়া বৃথা মায়ায় মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিও না। বরং যাহাতে পরলোকে আমার কল্যাণ লাভ হয়, তাহার জন্য কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠান কর। প্রবোধচন্দ্র যদি তপোবন হইতে আসিয়া থাকে, তবে তাহাকে বল, সে একবার আমার নিকটে বসিয়া হরিনাম গান করুক।

পরিচারিকা পূর্ব্ববৎ সরোদনে কহিল, "দাদা প্রবোধচন্দ্র এখনও তপোবন হইতে আসেন নাই। প্রাতঃকালে তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক গিয়াছে, এখনও কেন আসিলেন না বলিয়া, মা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন।"

রমেশ। কেন কমলিনি! ভক্ত প্রবোধের জন্য ভাবনা কেন? জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তাহার কোন বিপদ নাই, তাহা কি জান না? ত্রিজগতের নাথ যিনি, তিনি যখন তাহার সহায়, তখন ত্রিজগতে এমন কে আছে যে তাহার অমঙ্গল করিতে পারে?

কমলিনী মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে অতি কষ্টে বলিলেন, "না প্রভো! আমি প্রবোধের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভাবিতেছি না। আমি ভাবিতেছি যে, সে এই সময়ে আপনার কাছে থাকিলে আপনার যাতনার একটু লাঘব হইত।"

রমেশচন্দ্র সরলভাবে উত্তর দিলেন, "না কমলিনি! আমার কিছুই যাতনা নাই। বরং এতদিন প্রবাসবাসের পরে আজ নিজ গৃহে মায়ের কোলে যাইব বলিয়া বড়ই আনন্দ হইতেছে।" কমলিনী কাঁদিয়া, বলিলেন, "তুমি আর ও নিষ্ঠুর কথা মুখে আনিও না। তোমার কথা শুনিয়া

আমার প্রাণ যে ফাটিয়া যাইতেছে। হায়! বিধাতা আমার কপালে কত দুঃখই লিখিয়াছেন।" এই বলিয়া নিজ কপালে সজোরে করাঘাত করিলেন।

রোগীর মুখ আরও ম্লান হইয়া গেল। যেন কি একটা মর্ম্মান্তিক যাতনায় অস্থির হইলেন। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কমলিনীর মুখের দিকে শুষ্ক নয়নে চাহিয়া বলিলেন, "কমলিনি! এখনও তুমি এই বাল্যক্রীড়াবৎ সংসার-ক্রীড়াকে অসার বলিয়া বুঝিতে পারিতেছ না? হায় হায়! আমার মৃত্যুকালে তোমাকে অসার সংসার-সুখের প্রতি এত অনুরাগিনী দেখিয়া যাইতে হইল বলিয়া, আমার প্রাণ বড়ই ব্যথা পাইল। তুমি প্রবোধের জননী হইয়াও সংসারটাকে ধূলি খেলা বলিয়া বুঝিতে পারিলে না? কমলিনি! আমার আরও কাছে সরিয়া এস।" কমলিনী সরিয়া স্বামীর মস্তকের নিকটে আসিয়া বসিলেন। রমেশচন্দ্র সহধর্ম্মিণীর হস্তধারণ পূর্ব্বক বিনয় বচনে কহিলেন, "কমলিনি! আমার বিশেষ অনুরোধ, আমার দেহান্তে তুমি আনন্দ-আশ্রমের ঋষিপত্নীদিগের সঙ্গে আশ্রমবাসিনী হইয়া সাধনভজনে নিযুক্ত হইও। কি ইহকালে কি পরকালে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কোথাও নিস্তার নাই। অতএব সতি। এই হতভাগা স্বামীর কথায় অগ্রাহ্য করিও না।"

সতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "স্বামিন্! প্রভো! এ দাসী কবে আপনার কথা অগ্রাহ্য করিয়াছে? আমি আপনার কথাকে বেদবাক্য বলিয়া শ্রদ্ধা করি। আমি

এ জীবনে আপনাকেই আমার উপাস্য দেবতা বলিয়া জানিয়াছি। আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইয়া থাকি।"

ক্রমে বেলা অবসন্ন হইয়া আসিল। তৎসঙ্গে সঙ্গে রোগীর অবস্থাও অবসন্ন হইতে লাগিল। কমলিনী বুঝিলেন, তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। চিকিৎসক নিরাশ হইলেন। চারিদিকে হাহাকার রব উত্থিত হইল। রমেশচন্দ্র ধীরে ধীরে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা অন্তিমকালে আমার বন্ধু না হইয়া শত্রু হইলে কেন? আমি যে আনন্দধামে যাইতেছি, তোমরা তাহার কোন কথা না বলিয়া বালকবালিকার মত রোদন করিতেছ কেন? ইহাতে যে আমার বড়ই যাতনা হইতেছে।" এমন সময়ে হঠাৎ সত্যানন্দ, সত্যসখা এবং শান্তিপ্রিয় তথায় উপস্থিত হইলেন। কমলিনী তাঁহাদিগকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সত্যানন্দ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "মা! আপনি এত বুদ্ধিমতী হইয়াও হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে পারিতেছেন না?" কমলিনী আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যানন্দ! কই আমার প্রবোধ কই?" সত্যানন্দ উত্তর দিলেন, "শ্রীহরির আদেশে প্রবোধচন্দ্র অদ্য প্রাতঃকালে দেশভ্রমণের জন্য বহির্গত হইয়াছেন। এখান হইতে এই শোচনীয় সম্বাদ পৌঁছিবার বহুকাল পূর্ব্বে তিনি তপোবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন।"

এই কথা শুনিয়াই কমলিনী আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "প্রবোধরে! বাপ! তুমি এখনও জাননা, তোমার কি সর্ব্বনাশ হইতে চলিল।" রমেশচন্দ্র আবার তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "এখানে যদি কেহ আমার আত্মীয় থাক, তবে আমার নিকটে আসিয়া উপবেশন কর, এবং আমার কথা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।" তাঁহার এই কথায় সমুদায় পরিচারকপরিচারিকা এবং প্রতিবাসী আত্মীয়গণ সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি আজ তোমাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। তোমাদের যাহার নিকটে আমি যে অপরাধ করিয়াছি, আজ আমাকে তাহার জন্য ক্ষমা কর। আর একটী কথা আমি সকলকে বিশেষ করিয়া কহিতেছি, সকলে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর। এ সংসারকে তোমরা নিত্য বলিয়া বুঝিও না। অসার সংসারের মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া তোমরা সেই ইহকাল-পরকালের সম্বল শান্তিদাতা ভগবানের শীতল চরণপল্লবের ছায়ার আশ্রয় লইও, তাহা হইলে তোমাদিগের আর কোন অমঙ্গল থাকিবে না। আমি আজ তোমাদিগকে ছাড়িয়া অমৃতধামে গমন করিতেছি। আমার জন্য তোমরা বিন্দুমাত্রও শোক করিও না। সেখানে তোমাদের সকলের অপেক্ষা পরম-আত্মীয় একজন আছেন, আজ আমি তাঁহার অতুল স্নেহময় কোলে উঠিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া প্রাণ জুড়াইব।" এই কথা বলিতে

বলিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদরধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল।

একজন ঘোর বিষয়ী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি রমেশচন্দ্রের ভাব দেখিয়া ভাবিলেন,—তবে কি সংসারটা কিছুই নয়? রমেশচন্দ্র যেখানে যাইতেছেন, ঐ স্থানটাই কি সত্য?—রমেশচন্দ্রের একজন ঘোর অন্তরঙ্গ মৌখিক আত্মীয়তা দেখাইতে আসিয়াছিলেন, তিনি দুঃখ করিয়া মনে মনে বলিলেন, 'হায় হায়! লোকটা মরিবার সময় একবারও দুঃখ করিল না? তবে আর জব্দ হইল কৈ? বহুকাল পরে বিদেশ হইতে বাড়ী যাইবার সময় লোকে যেমন আনন্দ করে, এও যে তেমনই আনন্দ করিতেছে। যে মরিবার সময় হাসে, তাহাকে আর কিরূপে কাঁদাইব?' লোকটা তবু ছাড়িল না; একবার মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি রমেশ দাদা! প্রবোধ বাড়ী আসিল না, বিষয়-আশয়ের একটা বন্দোবস্ত করিলে ভাল হইত না?" রমেশচন্দ্র শান্তভাবে বলিলেন, "ভাই! এ সময়ে হরি-নাম না করিয়া ও পাপ কথা কেন মুখে আনিতেছ?" পরে তিনি সত্যানন্দকে কহিলেন, "বৎস সত্যানন্দ! অন্তর্যামী হরি আমার অন্তরের ভাব জানিয়াই উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন। এ সংসারে আমার আর অন্য কোনও কথা শুনিবার ইচ্ছা নাই। তুমি একবার হরিনাম শুনাও।"

সত্যানন্দ একতারা বাজাইয়া গান ধরিলেন। সত্য-সখা ও শান্তিপ্রিয়ও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিল—

"হরিবোল হরি, চল যাই বাড়ী,
বেলা গেল সন্ধ্যা হল।
ফুরাল খেলা, ভাঙ্গিল মেলা,
আর কেন বিলম্ব বল।
বিদেশে প্রবাসে, ভবপান্থবাসে,
কিছুই আর লাগে না ভাল ;
বাড়ী পানে মন, ছুটেছে এখন,
মা মা বলে ঘরে চল।
মায়ের আনন, করি দরশন,
তাপিত প্রাণ হবে শীতল ;
আছেন জননী, দিবস রজনী,
আশা পথ চেয়ে কেবল ;—
মায়ের প্রাণ টানে, সন্তানের পানে,
ভাবিলে নয়নে ঝরে জল ;
আহা মা আমার, প্রেমের আধার,
আপন প্রেমে আপনি বিহ্বল।"

গান সমাপ্ত হইলে দেখা গেল, রোগী নিমীলিত নয়নে বক্ষে হস্ত দিয়া ইষ্টদেবের ধ্যান করিতেছেন। সমস্ত গৃহ নীরব। ক্ষণকাল পরে রোগীর মুখ হাসিয়া উঠিল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। রোগী অতি ক্ষীণ স্বরে একবার বলিলেন, "আহা মা! তুমি ডাকিতেছ? যাই মা! যাই, তোমার কোলে যাই।" আর কোন কথা শুনা যাইল না।

কমলিনীর প্রাণে যেন হঠাৎ কি একটা ভাবের উদয়

হইল। তিনি পরিচারিকাদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা শীঘ্র চন্দন এবং ফুলের মালা লইয়া আইস, আমি আজ দেবতাকে পূজা করিব। আর শঙ্খটাও অমনই আনিও, দেব-দূতের স্বর্গারোহণ কালে একবার বাজাইব।" পরিচারিকাগণ শীঘ্রই সমুদায় আনিয়া দিল। কমলিনী স্বামীকে নমস্কার করিয়া তাঁহার গলায় ফুলমালা দিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলে ভাবিলেন, কমলিনী শোকে পাগলিনী হইয়াছেন। কমলিনী সত্যানন্দকে কহিলেন, "বৎস! ছেলে মায়ের কোলে যাইতেছে, এই সময় আর একটা গান কর।" ঋষিবালকেরা গাহিলেন —

"তোমারে প্রাণের আশা কহিব।
সুখে দুঃখে শোকে, আঁধারে আলোকে,
চরণ চাহিয়ে রহিব।
কেন এ সংসারে, পাঠালে আমারে,
তুমি তা জান প্রভু গো;
তোমারই আদেশে, রহিব এ দেশে
সুখ দুঃখ যাহা দেবে সহিব।
যদি বনে কভু, পথ হারাই প্রভু,
তোমারই নাম ধরে ডাকিব;
বড়ই প্রাণ যবে, আকুল হইবে,
চরণ হৃদয়ে লইব;—
তোমারই জগতে, প্রেম বিলাইব,
তোমারই কার্য্য যা সাধিব;

শেষ হয়ে গেলে, কোলে নিও তুলে,
বিরাম আর কোথা পাইব॥"

প্রতিবাসীরা পরস্পরে বলিলেন, "চল, আর কেন? খেলা ফুরাইয়াছে, মেলা ভাঙ্গিয়াছে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রামদাস।

প্রবোধচন্দ্রের বন্ধু শ্যামদাসের পরিত্রাণের সংবাদ পাঠকপাঠিকা শ্রবণ করিয়াছেন, এক্ষণে রামদাস কিরূপে মহাপাপ রূপ আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিল, তাহাই বর্ণনা করিব। মহাপাপ করিলেও পাপী যে একদিন ভগবৎ কৃপায় মুক্তিলাভ করে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। জগাইমাধাই ও সল প্রভৃতিই তাহার দৃষ্টান্ত। মানবাত্মা পুণ্যময় ব্রহ্মস্বরূপ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং এক সময়ে তাহাতেই বিলীন হইবে, সুতরাং চিরকাল পাপপঙ্কে নিমগ্ন থাকা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। এ কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, মহাপাপীরও আশা আছে। আমরা জগতে এই আশার সমাচারই ঘোষণা করিতেছি। যাঁহারা বলেন, ঈশ্বর মানবাত্মার জন্য এক অনন্ত নরকের সৃষ্টি করিয়াছেন,

আমাদের মতে তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা বড়ই অল্প। অন্ধ বিশ্বাস ভিন্ন জ্ঞানে এবং যোগভক্তিতে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। আমরা বিধানবিশ্বাসী; আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, বিশ্বনাথ মানবের শরীর রক্ষার জন্য যেমন নানাবিধ আয়োজন করিয়াছেন, আত্মার মুক্তির জন্যও তেমনই অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পাপী তাপী সাধু সকলকেই তিনি নিজ চরণ-পল্লবের ছায়ায় স্নিগ্ধ করিবেন। ইহকালে যেমন অতুল যত্নে জননীর মত সর্ব্বদাই আমাদিগকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন, পরকালেও তেমনই প্রেমপুণ্যদায়িণী হইয়া অনন্তকাল নিজ বক্ষে রাখিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। আমাদিগের উন্নতির জন্যই তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যিনি যতই কেন পাপী হউন না, আশার সহিত সাধনে প্রবৃত্ত হউন, নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবেন।

বর্দ্ধমানের সন্নিকটে এক বিজন অরণ্যের মধ্যে মুসলমান ফকিরের বেশে রামদাস অবস্থিতি করিতেছে। সে বনের ভিতরে সহজে কেহ কখন গমন করে না। এক বৃক্ষমূলে বসিয়া বিষণ্ণবদনে ফকির কি চিন্তা করিতেছে। মুখশ্রীতে কেমন একটা যন্ত্রণাব্যঞ্জক ভাব প্রকাশিত হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে রামদাস ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "আর পারি না; মর্ম্মান্তিক যাতনা কিছুতেই আর সহ্য হয় না। আজ প্রায় এক বৎসরেরও অধিক কাল এইরূপে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ভাল

করিয়া খাইতেও পাই না, একটু আরামে ঘুমাতেও পাই না। এত যাতনা সহ্য করিয়া কি মানুষ বাঁচে? হিন্দুর ছেলে মুসলমান ফকির সেজে নাম বদলাইয়া দেশে দেশে ঘুরিতেছি, তথাপি নিস্তার নাই। ভয় যেন প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে। ভগবান কবে যে আমাকে এ কষ্ট হইতে উদ্ধার করিবেন, তাহা জানি না।” বলিয়াই একবার চমকিয়া উঠিল। আবার বলিল, “আমি ত এ জন্মে একবারও ভগবানকে ডাকি নাই, তিনি যে আছেন, তাহাও একবার মনে করি নাই। দিবারাত্রি কেবল পাপেরই সেবা করিয়াছি। এমন ঘোরতর পাপ কিছুই নাই, যাহা আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইয়াছে। শেষে হত্যাকাণ্ডেও লিপ্ত হইয়াছি। তবে ভগবান আমাকে উদ্ধার করিবেন কেন? যাহা হউক, আমার এ কষ্ট ত আর সহ্য হয় না। এইজন্যই লোকে পাপ করিতে অত ভয় করে।” ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, “তবে কি সত্যসত্যই আমাকে পাপের জন্য নরকে যাইতে হইবে? না,—বোধ হয়, স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি সকলই কল্পনা। আগেকার ঋষিরা ঐ সব কথা বলিয়া লোকদিগকে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন। ‘জোর যার মুল্লুক তার’ ইহাই হইল আজকালকার উন্নত সভ্য মত। ডাকাইতি করিয়াছি বলিয়া কি পাপ হইয়াছে? তবে ত যত রাজা সকলেই পাপী। ইংরাজরাজ তবে ত পাপীর অগ্রগণ্য! তাঁহারা কত যুদ্ধে অসংখ্য অসংখ্য নরনারী হত্যা করিয়াছেন। ডাকাইতি ছোট যুদ্ধ, আর ও সব বড়

যুদ্ধ, এই মাত্র প্রভেদ। আমার অপেক্ষা বরং রাজারাই অধিক পাপী। লোকে বলে, মদ খাইলে পাপ হয়। কেন, তাহাতে ত আর কাহারও কিছু ক্ষতি হইতেছে না? মদ খাইলে প্রাণে একটু উল্লাস হয়, মনোদুঃখের সময় দুঃখের অনেকটা লাঘব হয়। তবে মদে কি দোষ? মদ ত দুঃখ রূপ রোগের মহৌষধি! আর আজকাল মদ কেই বা না খায়? মদ না খাইলে আজকাল আর লোকের কাছে মুখ দেখান যায় না। এমন কি, কোন বড় লোকের সহিত মিশিতেই পারা যায় না। কিন্তু, ব্যভিচার করাটা বোধ হয় পাপ। কেন, তাই বা কিসে? ব্যভিচার যদি পাপই হইবে, তবে মুনি-ঋষিরা কিরূপে উহা করিতেন? ব্যাসদেবের জন্ম-কাহিনী কে না জানে? ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের কথা সকলেই অবগত আছে। আর কত মুনিঋষিই যে অপ্সরা-দিগের দর্শনে বিকলচিত্ত হইতেন, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। এ বিষয়ে স্বর্গের দেবতারাও বড় কম ছিলেন না। ইন্দ্র প্রভৃতি এক এক জন এ বিষয়ে এক এক অবতার। আবার আমাদের গোকুলের চাঁদ যিনি, তাঁহার দিকে তাকাইলে আর জ্ঞান থাকে না।" কিছুকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিল, "দূর হউক, পাপ টাপ সবই মিছে।"

হঠাৎ বনের মধ্যে এক প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল আন্দোলিত হইতে লাগিল। পক্ষিকুল কুলায় ছাড়িয়া আকুল হইয়া উড়িতে লাগিল.

এবং শ্বাপদগণ আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৌড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশ কিন্তু মেঘশূন্য। ফকির চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। হঠাৎ এই প্রবল বাতাস কোথা হইতে উত্থিত হইল, তাহার কোনই কারণ অবধারণ করিতে না পারিয়া একটু ভীত হইল। ক্রমে সেই ঝটিকার ভিতর হইতে এক দিব্যমূর্ত্তি পুরুষ যুদ্ধবেশে অসিহস্তে আবির্ভূত হইলেন। রামদাসের প্রাণ একেবারে উড়িয়া গেল। 'এ কে? হঠাৎ বনের ভিতর যোদ্ধা পুরুষ এ কে? আমাকে বধ করিবে না কি?' ইত্যাদি কতরূপ মনে মনে ভাবিতে লাগিল। দিব্য পুরুষ রামদাসের সমীপস্থ হইয়া ঘনঘোর রবে কহিলেন, "রে নরাধম! মুসলমান সাজিয়া নাম বদলাইয়া বনের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিস্ বলিয়াই কি তুই জ্বলন্তদৃষ্টি ঈশ্বরের শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিবি? পৃথিবীর রাজশাসন হইতে তুই একরূপ নিষ্কৃতি পাইতে পারিস্, কিন্তু, মনেও ভাবিস্ না যে, স্বর্গরাজ যিনি, সেই সর্ব্বদর্শী ন্যায়বান বিধাতা পুরুষের অখণ্ড ন্যায়দণ্ডের শাসন হইতে এরূপে কখনও পরিত্রাণ পাইবি? পৃথিবীর রাজা জানেন না যে, তুই এই বনের মধ্যে এইরূপে লুক্কায়িত আছিস্, কিন্তু, ধর্ম্মরাজ যিনি, তিনি তোরে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে তুই চিরকালই ধৃত হইয়া রহিয়াছিস্। পৃথিবীর আদালতে তোর পাপের বিচার না হইতেও পারে, কিন্তু, স্বর্গের আদালতে তোর মহাপাপের বিচার হইবেই হইবে।"

রামদাস তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি একজন কোমলাঙ্গ বালকমাত্র। মনে করিল, আমার এক লাঠি খাইলেই বোধ হয় এ প্রাণে মরিবে। তবে আর ইহাকে ভয়ই বা কি? যাহা হউক, এ বনের মধ্যে এ কোথা হইতে আসিল, তাহার পরিচয়টা একবার জিজ্ঞাসা করি।' মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সে মৌখিক সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ বনের মধ্যে তুই কে? তোকে ত' দেখিতে সামান্য বালক বলিয়াই বোধ হয়। জানিস্ আমি কত বড় ডাকাইত?" যোদ্ধা সদর্পে বলিলেন, "আমি ভগবানের নিয়োজিত দূত। আমার নাম বিবেক। আমি ঈশ্বরের আদেশে তোর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি।" রামদাস বলিল, "কে তোর ঈশ্বর? আমি তাহাকে মানি না। তুই যদি আমার এই লাঠির প্রহার সহ্য করিতে পারিস্, তবে এখানে দাঁড়াইয়া থাক্, নৈলে এখনই পলায়ন কর্।" বিবেক হাসিয়া বলিলেন, "ওরে মূর্খ। আমার কি মৃত্যু আছে? না, আমার এ শরীরে কোনও আঘাত লাগে? পাপের সহিত যুদ্ধে সময়ে সময়ে হীনবল হই বটে, কিন্তু সে অতি অল্প সময়ের জন্য। মুহূর্ত্তেকের ভিতরে অমিত বল ধারণ করিয়া পাপবংশকে সমূলে বিনষ্ট করি। জগতের আদিকাল হইতেই আমরা কয়েকজন এইরূপে পাপাসুরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি। আমরাই সকলকে পরাজয় করিয়াছি, আমাদিগকে কেহই একবারও পরাজয় করিতে পারে নাই। ওরে নির্ব্বোধ! আমরা যে ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান। ভগবানকে কে পরাজয়

করিবে বল্? যাঁহার কটাক্ষে সূর্য্যচন্দ্রসমন্বিত সমুদায় সৃষ্টি লয় হইয়া যায়, আমরা তাঁহারই আশ্রিত। এ সংসারে যে কেহ ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া অধর্ম্মের পথে গমন করে, স্বর্গরাজ ঈশ্বর অমনই আমাদিগকে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তুই ধর্ম্মের পথ ঈশ্বরের পথ ছাড়িয়া একেবারে ঘোরতর পাপের পথ অবলম্বন করিয়াছিস্, তাই আজ ধর্ম্মাবহ ভগবান আমাকে তোর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি সহজে আমার শাসন গ্রাহ্য না করিস্, তবে নিশ্চয়ই এই খরতর অসির আঘাতে তোরে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিব।"

রামদাস মনে করিল, যদি এ বালক সত্যসত্যই ঈশ্বরের দূত হয়, তবে ইহার সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেও আমার সদ্গতি হইবে; আর যদি অন্য কেহ হয়, তবে আমার লাঠির প্রহারে নিশ্চয়ই শমন-সদনে গমন করিবে। এই-রূপ ভাবিয়া সে বিবেককে কহিল, "আমি বিনা যুদ্ধে তোর নিকটে মস্তক অবনত করিব না। আয়, একবার যুদ্ধ কর্, দেখি তোর শরীরে কত বল আছে।"

উভয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রামদাসের হস্তে যষ্টি এবং বিবেকের হস্তে অসি। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পরে বিবেক রামদাসকে ভূতলশায়ী করিয়া তাহার হস্তস্থিত যষ্টিগাছি কাড়িয়া লইলেন, এবং তাহার বক্ষঃস্থলে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! এইবার দেখ্ আমার পরাক্রম কত! এখনও যদি আমার কথা শুনিয়া ধর্ম্মের পথে চলিস্, তবুও আমি তোরে প্রাণে রক্ষা করি।" রামদাস দেখিল, প্রাণ

যায় যায় হইয়াছে। সুতরাং তখন সে যোড়করে বলিল, "দেব-দূত! বিবেক! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে প্রাণে বিনষ্ট করিও না। বল, আমি এখন কিরূপে ধর্ম্ম সাধন করিব? এতকাল আমি পাপ করিয়া আমার নিজেরই পরকাল নষ্ট করিয়াছি। এখন তুমি আমাকে উদ্ধার কর।"

বিবেক রামদাসকে ছাড়িয়া দিলেন। দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "রামদাস! এ জীবনে তুমি যে সকল মহা মহা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার শাস্তি তোমাকে পাইতেই হইবে। জগতে এপর্য্যন্ত পাপ করিয়া কেহই নিষ্কৃতি পায় নাই। ন্যায়বান বিধাতার সূক্ষ্ম বিচারে কাহারও পরিত্রাণ নাই। তুমি সতীর সতীত্ব হরণ করিয়াছ, বিশ্বাসী বন্ধু প্রবোধচন্দ্রকে সাংঘাতিক রূপে আঘাত করিয়া তাহার অর্থ হরণ করিয়াছ, কত ডাকাইতি করিয়াছ এবং ডাকাইতি করিতে গিয়া কত নরহত্যা করিয়াছ। এতদ্ভিন্ন, ছোট ছোট পাপ যে কত করিয়াছ, তাহার ইয়ত্বা নাই। তুমি কি মনে কর, এসকলের জন্য তোমার কিছুই শাস্তি হইবে না? তুমি নিশ্চয়ই জানিও, তোমার জন্য মহা রৌরবের জ্বলন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে। কয়দিনের জন্য সংসারে আসিয়া এত উপদ্রব কেন? আসুরিক বলে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মকে এত অগ্রাহ্য করিয়াছ কেন?"

এবার রামদাসের পাষাণ প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে বিবেকের পদমূলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। করযোড়ে বলিল, "প্রভো! না বুঝিয়া এত পাপ করিয়াছি, এখন

উপায় কি ?" বিবেক বলিলেন, "উপায় করিবার জন্যই ত আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি। পতিতপাবন যিনি, পাপীর গতি যিনি, পাষণ্ডদলন যিনি, তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত জপ কর।' তাহা হইলেই উদ্ধার লাভ করিবে।" রামদাস সরোদনে বলিল, "বিবেক! এ পাপ মুখে ও পুণ্যময় নাম যে উচ্চারণ করিতে পারিব না ?" বিবেক কহিলেন, "ভয় নাই। আমার প্রভাবে তোমার অসাড় জিহ্বায় শক্তি সঞ্চারিত হইবে। এখন আমি যাহা যাহা বলি, তাহাই কর।" এই বলিয়া তিনি রামদাসকে যোগাসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্রমাগত হরিনাম উচ্চারণ করিতে বলিলেন। রামদাস বিবেকের উপদেশে সেই অরণ্যের মধ্যেই নামসাধন আরম্ভ করিল।

কিছুদিন পরে বিবেক আবার তথায় আগমন পূর্ব্বক সন্দর্শন করিলেন, রামদাস দীনহীন কাঙ্গালের মত মৃত্তিকায় পড়িয়া "হরি হরি" বলিতেছে। বিবেক ডাকিলেন, "রামদাস!" রামদাসের কোনই উত্তর নাই। আবার ডাকিলেন, "রামদাস! গাত্রোত্থান কর।" এখনও রামদাস সংজ্ঞাশূন্য। মুখে কিন্তু হরিনাম ঘন ঘন উচ্চারিত হইতেছে। শরীর নিতান্ত কৃশ, চক্ষের জ্যোতিঃ নাই বলিলেই হয়। অনেক যত্নের পরে রামদাস অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, "কে গা তুমি ? আমার কথা কহিবার শক্তি নাই। বলিতে পার, হরি কি আমার মত পাপীকে দয়া করিবেন ?" বিবেক উত্তর দিলেন, "আমি বিবেক। তোমার ভয় নাই, হরি তোমাকে দয়া করিবেনই করিবেন।

তুমি এত ক্ষীণ হইয়াছ কেন? আহার করনা নাকি?” ধীরে ধীরে রামদাস বলিল, “আপনি যে দিন আমাকে প্রথম দর্শন দিলেন, সেই দিন হইতে আমি আর আহার করি নাই।” “আহা! তোমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। হরি-ধনকে পাইতে হইলে এমনই কষ্ট না করিলে হয় না। তুমি অচিরাৎ সিদ্ধকাম হইবে। এখন আমার কথা শ্রবণ কর। এই ফলটী আহার কর।” এই বলিয়া তিনি রামদাসের হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাকে মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিলেন, এবং একটী ফল দান করিয়া বলিলেন, “তুমি ভোজন করিতে আরম্ভ কর, আমি জল আনয়ন করি।” এই কথা বলিয়া তিনি জল আনয়ন করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। রামদাস উপবিষ্ট হইয়া ফল-ভোজন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই বিবেক এক পাত্রে করিয়া সুনির্ম্মল জল আনিয়া তাহাকে প্রদান করি-লেন। ফলভোজন ও জলপান করিয়া রামদাস একটু সুস্থ হইল। বিবেক জিজ্ঞাসা করিলেন, “এতদিন হরিনাম জপ করিয়া কিছু উপকার পাইয়াছ কি?” রামদাস উত্তর দিল, “এখনও বিশেষ কিছু উপকার বুঝিতে পারি নাই। তবে দীনবন্ধুর দয়া বিনা আমার যে আর অন্য উপায় নাই, ইহাই কেবল বুঝিয়াছি।”

বিবেক আপন হস্তস্থিত একতারা রামদাসকে অর্পণ করিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, এবার হইতে এই একতারার সুরসংযোগে নাম সাধন কর, ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার পাইবে।” বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

রামদাস সুরসংযোগে হরিনাম গান করিতে আরম্ভ করিল। অন্য কোন সঙ্গীত জানে না, কেবল 'হরিবোল' 'হরিবোল' 'হরিবোল' সুর করিয়া এই কথাই বলিতে লাগিল। সমস্ত দিন নামসাধন করিয়া সন্ধ্যার সময় কেবলমাত্র কিছু ফলভোজন ও জলপান করে। এই-রূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। আবার বিবেক সমুপ-স্থিত হইয়া বলিলেন, "রামদাস! আর এ বনের মধ্যে এরূপে কাল যাপন করিবার আবশ্যকতা নাই। এখন তুমি লোকালয়ে গিয়া সাধুসঙ্গ অন্বেষণ কর, এবং ভিক্ষা করিয়া অন্ন আহার করিতে আরম্ভ কর। সাধুসঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইবে। সাধুসঙ্গ না হইলে কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারে না।" রামদাস জিজ্ঞাসা করিল, "লোকালয়ে যাইলেই যে আমার অপরাধের নিমিত্ত আমাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে?" বিবেক বলিলেন, "যদি দণ্ডিত হইতেই হয়, তাহাতে তোমার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। ঈশ্বর যাহা করিবেন, তাহা মঙ্গলই করিবেন। অতএব ঈশ্বরের উপরে আত্মসমর্পণ করিয়া বহির্গত হও, যাহা হয় হইবে।"

রামদাস। এই মুসলমান ফকিরের বেশে যাইব, কি আমার পূর্ব্বের বেশ ধারণ করিব?

বিবেক। তুমি কি এখনও লুকাইতে চাও? ছদ্মবেশ যে মহাপাপ, তাহা কি তুমি জাননা? ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের রাজ্যে ও সকল চাতুরী চলিবে না। তুমি তোমার পূর্ব্বের বেশ ধারণ করিয়াই বহির্গত হও।

রামদাস। সাধুসঙ্গ কোথায় মিলিবে ?

বিবেক। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অন্বেষণ কর। অন্বেষণ করিতে করিতেই কোন স্থানে না কোন স্থানে মিলিবে। যত্ন না করিলে সাধুসঙ্গ রূপ অমূল্য নিধি ঘরে বসিয়া কে কোথায় পাইয়াছে বল ?

রামদাস। ডাকিলেই তোমার দর্শন পাইব ত।

বিবেক। অবশ্যই পাইবে।

বিবেক বিদায গ্রহণ করিলেন, এবং রামদাস বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ অন্বেষণের জন্য বহির্গত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

তিন বন্ধু।

অম্বিকাকাল্‌নার এক গৃহস্থের দ্বারে বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় রামদাস আসিয়া ভিক্ষার্থে গান ধরিল—

"কাতর প্রাণে ডাকি তোমা তাই।

আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর তোমা বই আর গতি নাই

মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন, সদাই হৃদয় মাঝে প্রেম-ফুলে নাথ পূজিব চরণ, ঘুচাও পাপের জ্বালা, পুরাও আশা, আমি তোমার গুণ নিয়ত গাই।'

গৃহের ভিতর হইতে একজন বাহিরে আসিয়া দেখিল, এক ভিখারী ভিক্ষার জন্য গান করিতেছে। সে তাহাকে

ডাকিয়া গৃহের ভিতরে লইয়া গেল। রামদাস গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, প্রবোধচন্দ্র ও শ্যামদাস সন্ন্যাসীর বেশে উপবিষ্ট। দেখিয়াই সে "প্রবোধ! প্রবোধ! আমাকে রক্ষা কর," বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পতিত হইল। প্রবোধচন্দ্র, কি শ্যামদাস, কি উপস্থিত অন্য কেহ, কেহই ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শ্যামদাস প্রবোধকে বলিলেন, "প্রভো! এ ভিখারী আমাদের রামদাস।" প্রবোধচন্দ্র বলিলেন, "ঠিক কথা, রামদাসই বটে।" সকলের শুশ্রূষায় রামদাস চৈতন্য লাভ করিয়াই উন্মত্তের মত আবার বলিল, "প্রবোধ! তুমি কি আমাকে বাঁচাইবে না?" প্রবোধচন্দ্র বলিলেন, "রামদাস! তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। একটু স্থির হইয়া আদ্যোপান্ত সকল বল।" রামদাস বলিল, "প্রবোধ! অগ্রে তুমি প্রতিজ্ঞা কর, যে, আমাকে কোন বিপদে ফেলিবে না, তাহার পর আমি সমুদায় বলিব।" প্রবোধচন্দ্র অম্লানবদনে বলিলেন, "আমার দ্বারা যদি তোমার কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে নিশ্চয়ই জানিও, তাহা ঘটিবে না।" রামদাস সকলকে সাক্ষী করিয়া বলিল, "আপনারা সকলে এবং পরমেশ্বর সাক্ষী, প্রবোধচন্দ্র আমাকে কোন বিপদে ফেলিবেন না।" প্রবোধের প্রাণটা চমকিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, 'রামদাস এরূপ করিতেছে কেন? তবে কি আমার কোন বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে? আমি ত সন্ন্যাসী, আমার আছেই বা কি, আমার আবার ক্ষতিই বা কি? যদি পিতামাতার নিকটে কিছু

করিয়া থাকে? তাহা হইলেই বা কি? রামদাসকে শাস্তি দিলেই কি সে ক্ষতি পূরণ হইবে? আপনার ভ্রাতা যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে, তাহাকে কি পরিত্যাগ করিব, না কঠোর শাস্তি দিব? আহা! আমার শ্রীহরিকে কেহ কটু বাক্য বলিলেও অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিলেও তিনি তাহাকে বক্ষে রাখেন। হরিদাস হইয়া আমি কি আমার অপরাধী বন্ধুকে প্রেমালিঙ্গন দিতে পারিব না? তবে মনে মনে এত তর্কবিতর্কই বা করিতেছি কেন? প্রাণ দিয়া জীবের সেবা করিতে হইবে, মা'র খাইয়াও প্রেম বিলাইতে হইবে। কেহ সর্ব্বনাশ করিলেও তাহাকে কোলে লইতে হইবে, কেহ প্রাণে বিনষ্ট করিলেও, তাহার জন্য, ঈশার ন্যায়, পরম পিতার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে হইবে।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি ভাবোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া রামদাসকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "রামদাস! ভাই আমার! তুমি যদি আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াও থাক, তবু তোমাকে আমি ক্ষমা করিব, এবং যদি আমার স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতাকে হত্যা করিয়াও থাক, তথাপি আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিব। দেবতা ইহার জন্য আমার আত্মায় বল বিধান করুন।"

রামদাস প্রবোধের ভিতরে এই দেবভাবের বিকাশ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কথা কহিবার কতই চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই পারিল না। নির্ব্বাক্ হইয়া আবার প্রবোধের পদমূলে পতিত হইল। প্রবোধচন্দ্র তাহার

হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি আমাদের গৃহে ডাকাইতি করিয়াছ। আমি শুনিয়াছি যে, তোমার ডাকাইতের দল ছিল। এখন বল, আমার পিতামাতা জীবিত আছেন ত? রামদাস! কথা কও না যে? নীরবে কেন? তবে কি আমার পিতামাতা জীবিত নাই? তুমি, তুমি রামদাস, তুমি কি তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছ? রামদাস! শীঘ্র বল, সত্য কথা বল। তুমি ত আমাকে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়াছ। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করিব না।" রামদাস অবাক্ হইয়া প্রবোধের মুখের দিকে নিস্পন্দনয়নে চাহিয়া রহিল। প্রবোধচন্দ্র আবার বলিলেন, "কেন রামদাস! আর আমায় অন্ধকারে রাখ? কি করিয়াছ বল, সত্য বল, শীঘ্র বল।" শ্যামদাস প্রভৃতি অন্যান্য সকলে অবাক্ হইয়া রহিলেন। রামদাস এখনও নীরব। কি বলিবে? সে কি বলিবার কথা? প্রবোধচন্দ্র আবার বলিলেন, "রামদাস! এখন আমি সন্ন্যাসী, এখন আমার ক্রোধ নাই, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছি। সত্যাসত্যই বল, পিতামাতা কি জীবিত নাই?" এবার অতি কষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে রামদাস উত্তর দিল, "প্রবোধ! ভাই আমার! কোন্ প্রাণে তোমায় নিদারুণ সংবাদ শুনাইব? আমি রামদাস, তোমার বন্ধু, তোমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছি। আমার হস্তের অস্ত্রাঘাতে তোমার—"

প্রবোধ। না—না—বল—বল—অস্ত্রাঘাতে কি-বল।

রামদাস। আমার হস্তের অস্ত্রাঘাতে তোমার পিতা—

প্রবোধ। থাম, থাম, রামদাস! আর কাজ নাই। বুঝিয়াছি, তুমি আমারি পিতৃহত্যা করিয়াছ! পিতৃঘাতক! পাষাণ্ড! (জিহ্বা কাটিয়া) অ্যাঁ! কি বলিলাম? কঠোর কথা! আমার যে পাপ হইল! পিতারি তঁ মৃত্যু নাই! কা'র সাধ্য মানবাত্মাকে বধ করে? মানবাত্মা যে অনন্ত জীবনের জন্য সৃজিত হইয়াছে! দেহ গেলই বা, তাহাতে কি ক্ষতি? আমি রামদাসকে আর কিছু বলিব না।' অবোধ ভাই আমার, না বুঝিয়া নরহত্যা করিয়াছে। এখন রামদাসের উপায় কি? রামদাসের পাপরাশি ধুইয়া যায় কিসে? কেন, হরিনাম? তাইত, আমি যেন সবই ভুলিয়া গিয়াছি। রামদাস! ভয় নাই, ভয় নাই! পাপের জন্য আর ভয় নাই! হরিনাম কর, প্রাণভোরে হরিনাম কর, সব পাপ বিনষ্ট হইবে। এই হরিনামে আমি তরিয়া গিয়াছি, আমার শ্যামদাস তরিয়া গিয়াছে, এই হরিনামে তুমিও তরিয়া যাইবে। (ক্ষণকাল পরে) উঃ! প্রাণটা যেন কেমন করিতেছে। বুকটা কাঁপিতেছে। একটু বসি।

প্রবোধচন্দ্র বসিয়া পড়িলেন। রামদাস প্রবোধের পিতৃহত্যা করিয়াছে শুনিয়া শ্যামদাস প্রভৃতির প্রাণ উড়িয়া গেল। তাঁহারা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কেহ কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলেন না, সকলেই যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে একটু শান্তভাব পরিগ্রহ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানী প্রবোধ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "শ্রীহরি! ইহাকেই

কি পরীক্ষা বলে? আমি কি আজ পরীক্ষায় পতিত হইয়াছি? সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল, পিতৃদেব প্রাণত্যাগ করিলেন! এ সংসারে আমার যে দাঁড়াইবার স্থান ছিল, সেটীকে বিনষ্ট করিলে? এখন তোমার দাস দাঁড়াইবে কোথায় বল ত? না, না, আমার ভুল হইয়াছে, ইহপরকালে তুমিই একমাত্র দাঁড়াইবার স্থল। তোমার আশ্রয় পিতামাতার আশ্রয় অপেক্ষাও আরামপ্রদ। আমি তোমাকে ভুলিয়া পাছে সংসারে আবদ্ধ হই, সেইজন্যই, বোধ হয়, তুমি এ কাজ করিলে। আহা! তাহা হইলে তোমার মত করুণাময় আর কেহই নাই। আমি বুঝিয়াছি, রঙ্গময়! এ তোমারই রঙ্গ। তবে আর কাহার কাছে কাঁদিব? মা যদি সন্তানকে প্রহার করেন, সন্তান 'মা' 'মা' বলিয়াই কাঁদে; আমিও তবে এখন চক্ষের জল মুছিয়া তোমারই নাম গান করি।" পরে তিনি শ্যামদাসকে কহিলেন, "শ্যামদাস! একটা গান কর।" শ্যামদাস উত্তর দিলেন "প্রভো! কি করিয়া গান গাহিব, বুক যে কাঁপিতেছে? মুখে যে কথা সরিতেছে না?" প্রবোধ প্রশান্তভাবে বলিলেন, "কেন ভাই! অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের জন্য শোক করা কিছুতেই উচিত নহে। আমাদের আদরের হরি, তিনি নিজেই যখন আমাকে এই অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আমার আর কি বলিবার আছে? তিনি যাহাতে আনন্দ অনুভব করেন, আমাদেরও তাহাতেই আনন্দিত হওয়া উচিত। তিনি যদি আমাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করিয়া আনন্দিত হয়েন, আমিও তবে দগ্ধ হইয়াই আনন্দিত হইব না কেন? আমার আনন্দের

একটা সুযোগ কেন ইচ্ছা করিয়া ছাড়িব? আহা ভাই! প্রাণ দিয়াও যদি তাঁহার এক বিন্দু সন্তোষসাধন করিতে পারি, তাহা হইলেই চিরকালের মত ধন্য হইব। আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও পিতৃহত্যা, তুমি নিশ্চয়ই বুঝিও, রামদাসের কার্য্য নহে; ইহা তাঁহারই চক্র। তিনি কিরূপে কি মহৎ কার্য্য সাধন করেন, তাহা কে জানে? ভাই! আমার প্রাণে আর এখন চাঞ্চল্য নাই। শ্রবণমাত্রেই একটু অধীর হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাও সাধনার অল্পতা বশতঃই। আমি সত্যসত্যই বলিতেছি, এখন আমি বেশ আছি।" পরে রামদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রামদাস! উঠিয়া উপবেশন কর। তুমি ভাই বিন্দুমাত্রও লজ্জিত হইও না। ইহাতে তোমার কিছুমাত্রও দোষ নাই। লীলাময় ভগবানই এ সব করিয়াছেন। আমার সুমঙ্গলের জন্যই তিনি এ সব লীলা করিয়াছেন। তবে মধ্য হইতে তোমার যে পাপ হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর।" দেখিলে শ্যামদাস! পুণ্যময় ঈশ্বর পাপ দ্বারা কেমন পাপকে বিনষ্ট করেন! রামদাস পূর্ব্বে পাপী ছিল, তাহার উপরে আবার এই সকল মহাপাপ করিয়া কেমন বৈরাগী হইয়াছে! এ সব ব্যাপার অবিশ্বাসীরা বুঝিতে পারে না। ঈশ্বরকে শতসহস্র ধন্যবাদ যে, তিনি আমাদিগকে তাঁহার এই সমুদায় লীলা বুঝাইয়া দিতেছেন।"

তাঁহার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইলেন, এবং বুঝিলেন, প্রবোধচন্দ্র একজন উচ্চ

অঙ্গের সাধক। শ্যামদাস তাঁহার পদধূলি গ্রহণানন্তর কহিলেন, "প্রভো! আপনার এতদূর সাধুতা দেখিয়া আমি বিমোহিত হইয়া গিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার মত পরীক্ষায় পড়িলে, আমি বিকলচিত্ত হইয়া না পড়ি।" প্রবোধ কহিলেন "শ্যামদাস! ঈশ্বরের নিকটেই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা কর। তাঁহারই কৃপাতে তুমি সমুদায় পরীক্ষাতেই জয়লাভ করিতে পারিবে।" গণ্ডকের গর্ভে পতিত হইলে, তাহা হইতে উত্থিত হইয়া, প্রবোধচন্দ্র শ্যামদাসের সহিত যে দোকানদারের দোকানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহার নিবাস এই অম্বিকাকাল্‌নায়; অদ্য তাঁহারই গৃহে এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। তিনি প্রবোধচন্দ্রের হৃদয়ের এত মহত্ত্ব দর্শনে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। এবং তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রভো! আমি আপনার সঙ্গ পাইয়া আমাকে ধন্য মনে করিতেছি। কৃপা করিয়া আমাকেও আপনার একজন বিশ্বস্ত দাস করিয়া লউন। আমি আপনার নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য দীক্ষিত হইব।" প্রবোধচন্দ্র তদুত্তরে কহিলেন, "আপনার উদ্দেশ্য সাধু। ঈশ্বর অবশ্যই আপনার এই সাধু সংকল্পের সহায় হইবেন। তিনি নিজেই আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান-ধন অর্পণ করিবেন। আমার দ্বারা আপনার কিছুই উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে সঙ্গে লইয়া আমার গুরুদেব মহর্ষি যোগানন্দের সমীপে উপস্থিত করিতে পারি।

গৃহস্বামী উত্তর দিলেন, "আপনার যেরূপ আজ্ঞা হইবেক, আমি তাহা পালন করিতে পারিলেই আমাকে কৃতার্থ মনে করিব।"

প্রবোধচন্দ্র আবার একটু বিবশমনা হইলেন। আবার যেন তাঁহার মুখশ্রীতে কেমন একটু কালিমার রেখা পড়িল। একবার চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক কহিলেন, "শ্যামদাস আবার প্রাণটার মধ্যে কেমন একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। এস সকলে মিলিত হইয়া একবার হরিনাম করি। দেখি হরিনাম বড় কি শোকানল বড়।" এই বলিয়া সকলে মিলিয়া গাহিতে লাগিলেন —

"আর বল্‌ব কি যেমন তোমার ইচ্ছা হয়।
হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে,
তোমার সম্পদ বিপদ আমার দুইই সমান ;
তুমি যে বিধি কর বিধি,   সেই হয় মঙ্গল বিধি,
গুণ নিধি হে—
ঘোর বিপদেও বল্‌ব তোমায় দয়াময়।"

কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। স্নানাহার ভুলিয়া সকলে দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নামগানই করিতে লাগিলেন। প্রাণের ভাবে নামগান করিলে কি আর রক্ষা আছে? তখনই গায়কের প্রাণে আগুন ছুটিয়া যায়। ভক্তদল আজ অগ্নিময় হইয়াই কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেলে তাঁহারা স্নানাহার করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। আহারান্তে

বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময়ে সকলে আনন্দ-আশ্রমে আসিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দ-আশ্রম।

উপাসক! ধীরে ধীরে আশ্রমপদে প্রবেশ কর। সাবধান, যেন সুপ্রভাতের সুবিমল শিশিরাচ্ছন্ন নবীন সুষমাময় ঐ ক্ষুদ্র দূর্ব্বাদলকে দলিত করিও না। উহারা অতি সামান্য হইলেও আনন্দময় দেবতা উহাদিগকে লইয়া প্রভাত সময়ে কতই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। উদয়াচলের নব ভানুর স্বর্ণকান্তি কিরণজাল আনয়ন পূর্ব্বক তিনি উহাদিগের লাবণ্যরাশি আরও সমুজ্জ্বলিত করিয়া দেন। এবং নবীন প্রভাতের সুস্নিগ্ধ ও সুগন্ধ মলয় সমীরকে ডাকিয়া করতালি দিয়া উহাদিগকে তালে তালে নাচাইয়া থাকেন, এবং আনন্দে বিগলিত হইয়া উহাদিগের সহিত আপনিও নৃত্য করেন। সাবধান, ঐ যে সুনীলশতকুসুমশালিনী ক্ষীণাঙ্গিনী অপরাজিতা লতা, প্রভাতের উজ্জ্বল আলোক যাহাকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়াছে, যেন উহার একটী পর্ণও ছিন্ন করিও না। শোভার আকর শ্রীহরি, এই সমুদায় অতুল শোভা সন্দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার অনন্ত মহিমার কিয়দংশ উপলব্ধি করিবার জন্যই, ইহাদিগকে আমাদের চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। অতএব শান্ত নয়নে উহাদিগকে দর্শন কর,

দেখিতে দেখিতে উহাদিগের ভিতরেই ভুবনরঞ্জন দেবতার শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া শোকসন্তাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবে। আর, ঐ শুন, প্রভাতপবনোত্থিত ঐ যে অমৃতরসময় শ্রুতিমধুর সঙ্গীতলহরী শ্রুত হইতেছে, উহা ঋষিবালকদিগের সমতান সামগান। যখন ঐ স্থানে উপনীত হইবে, তখন যেন কোনও প্রকারে উহার বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। এই আশ্রমশ্রীতে কেবলই শান্তিরস চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে, সাবধান, যেন কোনও রূপে তাহার অন্তরায় হইও না। ঐ দেখ, ঋষিবালকেরা বিভুগুণ গাহিতে গাহিতে এই দিকেই আসিতেছেন। আহা! উঁহাদিগের কি অপার সৌন্দর্য্য! মনে হইতেছে, যেন নন্দনকাননে অমরশিশু সকল সেই অমরজনবন্দনীয় অমৃতময় পুরুষের স্তুতিগান করিতেছেন! ঐ দেখ, উঁহারা এখন সঙ্গীত ভুলিয়া মালতিতরুমূলে মালতিকুসুম কুড়াইয়া মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ দেখ, একজন আর একজনকে আদরে সাজাইতেছেন। আ মরি মরি! কি অপরূপ ভ্রাতৃপ্রেম। পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে করিতে গাহিলেন—

"বড সাধ মনে, নিরখি নয়নে,
সে অমর পরিবার;
হৃদয় বেদনা, মরম যাতনা,
পাশরিব হে এবার।
প্রিয় দরশন, দেব দেবীগণ,
করে প্রেম বিনিময়;

মধুর মিলন, মধুর বচন,
সব যেন মধুময়।
কেহ কারো গলে, ধরি কুতুহলে,
দেয় প্রেম আলিঙ্গন;
বুকে চাপি ধরে, পুলকে শিহরে,
আনন্দে করে রোদন।”

আহা, কি প্রাণমনবিমোহিনী সঙ্গীতধারা! প্রাণ যে মুগ্ধ হইয়া গেল! গাও হে বালকগণ! আবার গাও। বালকদল আর না গাহিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ঐ দেখ, দুই জন ঋষিকন্যা ধীরে ধীরে এই দিকে আগমন করিতেছেন। দুই জনেরই মুখে যেন পবিত্রতার শুভ্র শতদল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। দেখিলেই দেবী বলিয়া নমস্কার করিতে বাসনা হয়। আহা, উঁহাদের কেমন নম্রভাব, কেমন গাম্ভীর্য্য, কেমন কোমলতা, কেমন সুমিষ্ট বাক্য! ঐ শুন, উঁহারা পরস্পর কি কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছেন। একজন আর একজনকে কহিলেন, “দেবি কমলিনি! স্বামিবাক্য প্রতিপালন করিয়া আপনার মনে বিমল আত্মপ্রসাদের উদয় হইয়াছে ত? আপনি আনন্দের সহিত আশ্রমবাসিনী হইয়াছেন ত? আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে, যে কোন ধর্ম্মকার্য্যই কেন হউক না, আনন্দের সহিত সাধন না করিলে, তাহাতে জীবের কোনই উপকার হয় না। যদি আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনি ইহাতে কোন ফলই লাভ করিতে পারিবেন না

সত্যসন্ধ রামচন্দ্র আনন্দের সহিত চীরবসন ধারণ ও কটুকষায় বন্য ফলমূল ভক্ষণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর বনচারী হইয়াছিলেন, তাই উহাতে তাঁহার ধর্ম্ম পালন হইয়াছিল। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহামনা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদীর সহিত আনন্দমনে কঠোর বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, সেইজন্যই তিনি স্বর্গলাভের উপযুক্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের জন্য প্রাণদান, তাহাও যদি কষ্টের সহিত হয়, তবে তাহা শতসহস্রবার নিষ্ফল হইয়া থাকে। অতএব দেবি! সমুদায় ধনজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমচারিণী হইয়াছেন বলিয়া আপনার মনে যেন ক্ষণেকের জন্যও অবসাদ উপস্থিত না হয়। নানাবিধ সুখাদ্যের পরিবর্ত্তে অতি সামান্য শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করিতেছেন বলিয়া, কিম্বা সুচিক্কণ পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে সামান্য গৈরিকবসনমাত্রে লজ্জা নিবারণ করিতেছেন বলিয়া আপনি যেন ম্রিয়মানা হইবেন না। আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, ও সকল আহারপরিচ্ছদে বিন্দুমাত্রও সুখ না হইয়া বরং রাশি রাশি অসুখই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ সংসারে যদি কোথাও বিমল শান্তিসুখ থাকে, তবে তাহা অনায়াসলভ্য শাকান্ন এবং সামান্য কৌপীনের মধ্যেই নিহিত আছে। এতদিন আপনি যথার্থ সুখের লেশমাত্রও প্রাপ্ত হয়েন নাই। এখন ঈশ্বর কৃপার নির্ভর করিয়া যদি সাধন করিতে পারেন, তবেই প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারিবেন।”

কমলিনী উত্তর দিলেন, “দেবি সুনীতি! তুমি যদিও

আমার কন্যার মত, তথাপি পবিত্রতায় এবং সাধনভজনে আমি তোমার শিষ্য বলিলেই হয়। তোমার নিকটে আমার মনোভাব প্রকাশ করিতে কিছুই আপত্তি নাই। আমি স্বামি-বাক্য প্রতিপালনের জন্য ইচ্ছা করিয়াই এই সন্ন্যাসিনী বেশে তোমাদের আশ্রমে আসিয়াছি। ইহাতে আমার প্রাণে সত্যসত্যই আনন্দের উদয় হইয়াছে। স্বামী যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন মনে করিয়াছিলাম, এ পাপ প্রাণ আর রাখিব না। প্রাণনাথের সঙ্গে সঙ্গেই আমিও ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে যাত্রা করিব। কিন্তু দেখি! ঠিক তিনি যে সময়ে স্বর্গারোহণ করেন, সেই সময়ে তাঁহার মুখশ্রী কেমন একটা আনন্দের হাসি হাসিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া আমার মনে হইল, তবে ত মৃত্যু দুঃখের ব্যাপার নহে। আহা! স্বর্গে যাইতে হইলে এইরূপ হাসিতে হাসিতে যাওয়াই উচিত। স্বামী আমার মহাজ্ঞানী ছিলেন, তিনি মৃত্যুদিনের প্রভাত হইতে সন্ধ্যাকালে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও কেবলই পরলোকের অপার আনন্দের কথাই বলিয়াছিলেন। এক নিমিষের তরেও তাঁহাকে বিষণ্ণ হইতে দেখা যায় নাই। ইহা দেখিয়া আরও বুঝিলাম— স্বামীর জন্য শোক করা উচিত নহে। কেন না, তিনি কোন আনন্দলোকেই গমন করিতেছেন, সেখানে গিয়া পরমানন্দেই বাস করিবেন। তবে আমি উঁহার জন্য শোক করিব কেন? আহা! এখানে, এই পাপ সংসারে, উঁহাকে কতই কষ্ট পাইতে হইয়াছে, যদি ভগবান উঁহার প্রতি সদয় হইয়া উঁহাকে কোন অমৃতলোকে লইয়া

যাইতেছেন, তবে আমি কেন তাহার জন্য বৃথা শোক করিয়া আপনাকে অশেষ যাতনা প্রদান করিব? বরঞ্চ মহাপুরুষের মহাপ্রস্থানের সময়ে মঙ্গলাচরণ করি।—এই ভাবিয়া প্রাণেশ্বরের দেহ পুষ্পচন্দনে বিভূষিত করিয়া ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলাম। তখন হইতেই আমার প্রাণ যেন কোন একটা অলক্ষিত আনন্দধামের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। স্বামী অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহান্তে আমি যেন এই আশ্রমে আসিয়া ব্রহ্মচর্য্য সাধন করি। তাঁহার আদেশানুসারে আমি তোমাদের এখানে আসিয়াছি। দেবি! বলিতে কি, এখানে আসিয়া বাস্তবিকই আমার প্রাণে শান্তি হইয়াছে। তোমাদের এখানে কেমন পবিত্রতা, কেমন ভক্তিভাব, কেমন পরস্পরে ভালবাসা। আহা! তোমাদের ছেলেগুলি যেন স্বর্গের বালক। এ সংসারে আমি এমন অপরূপ স্থান আর কোথাও দেখি নাই।” এমন সময়ে ঋষিবালকেরা গাহিতে গাহিতে আসিল,—

“আহ্লাদে গলিয়া, কোলে মাথা দিয়া,
কেহ মৃদু মৃদু হাসে ;
কেহ ভক্তিভরে, প্রণিপাত করে,
পরস্পরে ভালবাসে

আসিয়াই তাহারা সুনীতি ও কমলিনীকে প্রণাম করিল। কমলিনী প্রেমচন্দ্রকে কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা! কাঁহাদের কথ বলিতেছ?”

প্রেমচন্দ্র মধুর স্বরে বলিল, "যাঁহাদের কথা শুনিলেও প্রাণের অশান্তি দূরে যায়, সেই অমরপুরনিবাসী অমর-দলেরই কথা বলিতেছি।" কমলিনী আবার মুখচুম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, "আহা! তোমাদের দেখিলেও প্রাণ জুড়ায়। যাও বনের পাখি! মধুর কণ্ঠে আশ্রমভূমিকে নিনাদিত করিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াওগে। আমি আর তোমাদের ধরিয়া রাখিব না।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন। তাহারা গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল—

"কেহ কারে ধরি, তোলে কাঁধে করি,
নাচে হরি হরি বলে ;
ভকতে ভকত, করে সেবা কত,
প্রেমানন্দে ঢলে ঢলে।"

কমলিনী আবার বলিলেন, "সুনীতি! সত্যসত্যই বলিতেছি, এখানে আসিয়া আমার পতিশোকানল যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। যখন তোমাদের মুখে সাধনভজনের কথা শুনি, যখন তোমরা পরলোকের কথা আলোচনা কর, এবং যখন তোমরা যোগানন্দে মগ্ন হইয়া হরিনাম গান কর, তখন আমি যথার্থই কেমন পাগলের মত হইয়া উঠি। প্রবোধের মুখে তোমাদের কথা শুনিয়া আমার বড় ইচ্ছা হইত যে, একবার তোমাদিগকে দেখিয়া যাই। বাঞ্ছাকল্পতরু এতদিনে আমার সে বাসনা পূর্ণ করিলেন। যদিও স্বামীর মৃত্যুরূপ মহা যন্ত্রণার মধ্য দিয়া ভগবান আমাকে এখানে আনয়ন করিলেন, তথাপি আমি বলিতেছি, তিনি

যাহা করিয়াছেন, তাহা মঙ্গলই করিয়াছেন। আমি সংসার সুখের প্রতি বড়ই অনুরাগিনী ছিলাম। দুগ্ধফেননিভ শয্যাতেও আমার নিদ্রা হইত না। ক্ষীরসরনবনীতেও আমার আহারে পরিতৃপ্তি হইত না। নানাবিধ চাকচিক্য বসন এবং কত বহুমূল্য অলঙ্কারাদিতেও আমার মন সন্তুষ্ট হইত না। প্রাণেশ্বর আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, যখনই যাহা চাহিতাম, তখনই তাহাই আনিয়া দিতেন। এ সকলে আমার আত্মা অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছিল; সেই কারণেই কল্যাণদাতা ভগবান আমার মাথায় এক বজ্রাঘাত করিলেন, অমনই আমার সমুদায় বিলাসবাসনা চুরমার হইয়া গেল। সাংসারিক সুখের প্রতি যে জন একান্ত লোলুপ, তাহার আত্মার সদ্গতি কিছুতেই হয় না। তাই মঙ্গলময় দেবতা আমাকে এমন অবস্থায় নিক্ষেপ করিলেন যে, ধনজন থাকিলেও কোনও সাংসারিক সুখে আসক্তা হইতে পারি না। বহুমূল্যবান পট্টবসনেও আমার মন প্রসন্ন হইত না, কিন্তু আজ আমি এই গৈরিক বস্ত্রেই বিশেষ পরিতুষ্টা রহিয়াছি। ক্ষীরসর খাইয়াও তৃপ্তি পাইতাম না, কিন্তু, আজ আমি শাকান্নেই পরম পরিতৃপ্ত হইতেছি। শতপুর কোমল শয়নেও নিদ্রা হইত না, কিন্তু আজ আমি তৃণকুশাসনে পরম আরামে নিদ্রিতা হই। বোধ হয়, আমার প্রকৃত সুখরূপ প্রভাতের প্রথম আলোকচ্ছটা প্রকাশিত হইতেছে। বোধ হয়, আমার প্রাণপাখী অনন্ত ব্রহ্মানন্দরূপ মহদাকাশে উড়িবার উপক্রম করিতেছে। বোধ হয়, আমার মনমধুকর সচ্চিদানন্দ শ্রীহরির

চিরবিকসিত শ্রীচরণ-সরোরুহে চিরমগ্ন হইবার আয়োজন করিতেছে। এবং বোধ হয়, আমার পিপাসাতুর চিত্ত-চকোর এতকালের পরে সেই নিত্যবৃন্দাবনপ্রবাহিণী প্রেম-যমুনার আনন্দলহরীসন্তাড়িত দিব্য চন্দ্রচ্ছবির সুধাধারা পানের আশায় ছুটিবার উদ্যোগ করিতেছে।" ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "দেবি! একবার সেই গানটী গাও, যাহার প্রথম ছত্র—"তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামি।"

সুনীতি এক পুষ্পিত শেফালিকাতরুতলে বসিয়া বীণা বাজাইয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন, এবং কমলিনী আকুল হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। গায়িকা গাহিলেন—

"তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামি!
তোমারই প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলই সহিব আমি।
(তব) প্রেম আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না,
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি, তাই শোকসাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখ পূর্ণ,
(আমি) আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা অনুগামী।
মোহবন্ধ ছিন্ন কর, কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে থাক দিবসযামী।"

সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে কমলিনী যোগনিমগ্না হইলেন। ভক্তকণ্ঠোচ্চারিত সুধাময় সঙ্গীতলহরীর এমনই আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি যে, অতি পাষণ্ডের প্রাণকেও বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে। সাধ্বী সুনীতির স্বর্গীয় সঙ্গীতে কমলিনীর

প্রাণের জ্বালাযন্ত্রণা মুছিয়া গেল। তিনি যোগভরে ব্রহ্মানন্দরসসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ উন্মত্ত প্রবোধচন্দ্র সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে লইয়া "কৈ মা" "কোথা মা" বলিতে বলিতে তথায় উপস্থিত হইয়াই কমলিনীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার ক্রন্দনে কমলিনীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি সহসা প্রবোধচন্দ্রকে সন্দর্শন করিয়াই চীৎকাররবে কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রবোধচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "মা! মা আমার! গৃহলক্ষ্মি! তুমি কি আমার সেই মা? রাজরাণি! তুমি আজ কাঙ্গালিনী কেন? মা! নীরব কেন? কত কালের পরে তোমার কোলের ছেলে আদরের প্রবোধ ঘরে এলো, কোলে কর মা। মুখচুম্বন কর মা! আমি যে আজ কতদিন তোমার মুখে আদরের কথা শুনি নাই। আজ কতকাল যে তোমার কোলে উঠি নাই।" কমলিনীর প্রাণে যে কি ঘোর পরিবর্ত্তন হইল, কে তাহা বর্ণনা করিবে? তিনি বারম্বার চেষ্টা করিয়াও কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কেবল নির্নিমেষ নয়নে প্রবোধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কোলের ছেলেকে কোলে টানিয়া লইলেন। প্রবোধচন্দ্র আবার বলিলেন, "মা! তোমার কোলে উঠিয়া প্রাণ জুড়াইল। এ পাপ সংসারে মা বিনা আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায় বল? তাপিত প্রাণে আর কে শান্তিবারি ঢালিবে বল? মা! আদরিণি মা! একটীবার কথা বল।" বহু কষ্টে কমলিনী বলিলেন, "প্রবোধ! বাপ আমার! কি বলিব

বল? মুখে যে কথা ফুটিতেছে না।” প্রবোধ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “মা! পথিমধ্যে আমি সবই শুনিয়াছি। হায় হায়! আমার অনুপস্থিতিকালে আমাকে কিছু না বলিয়াই পিতৃদেব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন! আমার মত হতভাগ্য আর নাই।”

সুনীতি দেবী দণ্ডায়মানা হইয়া সুগম্ভীর মূর্ত্তিতে ধীরে ধীরে বলিলেন, “প্রবোধের মত মহাযোগীর এরূপে শোকাভিভূত হওয়া কখনই উচিত নহে।” প্রবোধ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, “দেবি! আপনাকে নমস্কার করি। সাধনের অল্পতা বশতঃই আমার প্রাণে চাঞ্চল্য আসিয়াছে।” এই কথা বলিয়া প্রবোধচন্দ্র উপবেশন করিলেন, এবং শান্তভাব অবলম্বন পুরঃসর জননীকে কহিলেন, “মা! আপনাকে প্রথম দর্শন করিয়াই আমার প্রাণে কেমন একটু শোকের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, এক্ষণে দেবী সুনীতির একটী কথাতেই তাহা বিদূরিত হইয়াছে। এখন বুঝিতেছি, ভগবান যাহা করিয়াছেন, তাহা মঙ্গলই করিয়াছেন।” কমলিনীও একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, “প্রবোধ! আমারও প্রাণে প্রথমে একটু বিকার উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তোমার কথাতে আমার সে বিকার কাটিয়া গেল। সত্যসত্যই, আমি প্রাণের সহিত বলিতেছি—‘মঙ্গলময় যাহা করিয়াছেন, তাহা মঙ্গলই করিয়াছেন।—’ প্রবোধ! আমি আর এখন তোমার সে রাজরাণী মা নই, আমি এখন একজন হরিধনের কাঙ্গালিনী। তুমি যে পথে আসিয়াছ, আমিও এখন সেই পথে

আসিয়াছি। আমি এখন বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, সাংসারিক সুখটা কিছুই নহে। প্রবোধ! তোমার পিতা মৃত্যুকালে যে অপরূপ স্বর্গীয় ভাব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি এজন্মে ভুলিব না। আমি তাহা দেখিয়াই পাগলিনী হইয়াছি।” প্রবোধ ঔৎসুক্য সহকারে কহিলেন, “বল মা! পিতৃদেবের শেষকালের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া প্রাণ শীতল করি।”

কমলিনী কহিলেন, “বৎস! দুরন্ত দস্যুগণ সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক তোমার পিতৃদেবের নিকটে গিয়া আরও অর্থ চাহিল। তিনি বলিলেন—‘আমার যাহা কিছু ছিল, তাহা সকলই তোমরা লুণ্ঠন করিলে, আমি আরও অর্থ কোথায় পাইব?—’ তাহারা এই কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া সজোরে তাঁহার মস্তকে এক তরবারির আঘাত করিল। তোমার পিতা সেই অস্ত্রাঘাতে অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। এই সময়ে মহা গণ্ডগোলে অনেক লোকের উপস্থিতিতে দস্যুগণ ধরা পড়িবার উপক্রম হইল। তাহারা অতিকষ্টে অনেক দ্রব্য ফেলিয়া পলায়ন করিল। এদিকে অনেকক্ষণ পরে তোমার পিতার জ্ঞানোদয় হইল। সেই রাত্রিতেই চিকিৎসক আসিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হায়! মৃত্যুরূপ রোগের ঔষধি এ সংসারে কে জানে বল? সকল ঔষধিই ব্যর্থ হইয়া গেল। রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। প্রবোধ! এই সময়ে তোমার পিতা মহাযোগীর মত ক্রমাগত যোগমগ্ন রহিলেন। আমরা কতই ভীত হইলাম, কিন্তু তাঁহার প্রাণে বিন্দুমাত্রও ভয় ছিল না। তিনি ক্রমাগত স্বর্গের কথাই বলিতে লাগিলেন।

বহুকাল পরে বিদেশ হইতে সন্তান মায়ের কাছে যাইবার সময়ে যেরূপ আনন্দোন্মত্ত হয়, তিনিও সেইরূপ পরমমাতার ক্রোড়ে যাইবেন বলিয়া আহ্লাদে বিগলিত হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখশ্রী আনন্দে হাস্য করিতে লাগিল। আহা প্রবোধ! সে অপরূপ ভাব বর্ণনা করিতে পারি না। তুমি যদি সেই সময়ে উপস্থিত থাকিতে, তাহা হইলে তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে। সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া আমি শোকসন্তাপ ভুলিয়া গিয়াছি, এবং বুঝিয়াছি, সংসার-সুখে উন্মত্ত থাকা ইচ্ছা করিয়া আত্মবিনাশ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি এ তপোবনে পরম শান্তিতে অবস্থান করিতেছি। এখানকার নরনারী এবং বালকদিগকে দেখিলে সত্যসত্যই স্বর্গের কথা মনে পড়ে।"

প্রবোধের চক্ষে আনন্দাশ্রু নিপতিত হইল। তিনি বলিলেন, "আহা মা! শ্রীহরির মঙ্গল ইচ্ছা স্মরণ করিলে সত্যসত্যই পাষাণ প্রাণে প্রেমের উদয় হয়। আমরা যদি সংসার-ক্রীড়ায় ভুলিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগের সদ্গতি হইবে না বলিয়াই, তিনি নানা বিপদের ভিতর দিয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রেম-লোকে লইয়া যাইতেছেন। মা! আপনি অবগত আছেন, তিনি কি কৌশলের মধ্যে ফেলিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। আবার আপনি অতিমাত্র চমৎকৃত হইবেন যে, পাষণ্ডদলন হরি কিরূপে আমার এই দুই বন্ধু রামদাস ও শ্যামদাসকে পরিত্রাণ দিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি রামদাস ও শ্যামদাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহারা দুই জন কম-

লিনীর পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, "মা! আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা হরিধনকে লাভ করিতে পারি।" রামদাস কিন্তু ক্রমাগত কম্পিত হইতে লাগিলেন। কমলিনী আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামদাস! তুমি এত কাঁপিতেছ কেন?" রামদাস নীরব রহিলেন। প্রবোধচন্দ্র কহিলেন, "মা! যে ঘটনায় পিতৃদেব পরলোকগত এবং আপনি আশ্রমচারিণী হইয়াছেন, রামদাসই সেই ঘটনার নায়ক।" কমলিনী চমকিয়া বলিলেন, "কি? কি? কি?" প্রবোধচন্দ্র কহিলেন, "মা! শান্ত হউন, অত চঞ্চলা হইলে নানা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা।" কমলিনী একটু স্থিরভাব পরিগ্রহ করিলে প্রবোধচন্দ্র কহিলেন, "মা! ভগবান রামদাসের দ্বারাই আপনার মুক্তির পথকে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তিনি রামদাসকেই দস্যু রূপে আমাদিগের গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন।" কমলিনী রামদাসের প্রতি সরোষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রবোধ বলিলেন, "ঐ যে মা! আপনার নয়ন ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করিতেছে? এ তপোবনে ত ক্রোধ নাই। আপনি তপোবনবাসিনী হইয়া তপোবনের বিঘ্ন উৎপাদন করেন কেন?" কমলিনী রামদাসকে কহিলেন, "রামদাস তোমারই এই কার্য্য?" প্রবোধ উত্তর দিলেন, "না মা! ভগবানেরই এই কার্য্য!" কমলিনী ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। আবার রামদাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রামদাস! তুমি কি মানব না রাক্ষস?" প্রবোধচন্দ্র আবার উত্তর দিলেন,

"রামদাস মানবও নহে, রাক্ষসও নহে, কিন্তু ভগবানের হস্তের যন্ত্র।" রামদাস কমলিনীর পদযুগল জড়াইয়া সরোদনে কহিলেন, "মা! মা! আমি মহাপাতকী, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" কমলিনী বলিলেন, "রামদাস! তুমিই এ সব ব্যাপার করিয়াছ শুনিয়া, আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছি। তুমি আমার শত্রু কি মিত্র, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি আমার স্বামিহত্যা করিয়াছ, তাহাতে আমার সংসারের সমুদায় আশাভরসা বিনষ্ট হইয়াছে; স্বামিহন্তা তুমি আমার ঘোর শত্রু। আবার স্বামীর মৃত্যুরূপ মহাবিপদের ভিতরেই আমি ব্রহ্মপদ-পঙ্কজের সুধাধারার আস্বাদন পাইয়া তাহা পানের জন্য লালায়িত হইয়াছি; এখানে তুমি আমার মিত্র। সুতরাং তুমি আমার শত্রু এবং তুমি আমার মিত্র। তোমার মত শত্রুর কার্য্যও কেহ করে না, আবার তোমার মত মিত্রের কার্য্যও কেহ করে না। তোমাকে দেখিয়া একবার আমি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিতেছি, আরবার তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। যাহা হউক, সাধু-বাক্যের সম্মাননা রক্ষা করিয়া কহিতেছি—'তুমি আমার ঘোর আততায়ী শত্রু হইলেও তোমাকে ক্ষমা করিলাম, এবং তুমি আমার অসার সাংসারিক সুখকে বিনাশ করিয়াছ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম'— ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" উপস্থিত ভক্তসমাজ আনন্দে শ্রীহরির জয় ঘোষণা করিলেন। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এবং অদূরে বালকেরা গাহিল—

"প্রণয় প্রসঙ্গে, ভাবের তরঙ্গে,
ভাসে বদনকমল ;
হরিলীলা কথা, কহিতে কহিতে,
আঁখি করে ছলছল।
হয়ে প্রেমে গদগদ, পূজে হরিপদ,
হরিভক্ত সাধুগণ ;
আহা কিবা ভ্রাতৃভাব, সরল স্বভাব,
কিবা নির্ম্মল জীবন।"

গান শুনিয়া শ্যামদাস প্রভৃতি কহিলেন, "আহা! এমন অপরূপ স্থান আর কোথাও দেখি নাই। এইখানেই যে স্বর্গ। এখানে আসিয়া আমাদের সমুদায় জ্বালাযন্ত্রণা দূরে গিয়াছে।" প্রবোধচন্দ্র কহিলেন, "আমার প্রিয় বালকগণ আসিতেছে। অনেক দিন পরে আজ উহাদিগকে দেখিয়া সুখী হইব।" বালকগণ গাহিতে গাহিতে আসিল—

'পলক বিচ্ছেদে, সারা হয় কেঁদে,
নাহি ছাড়ে কেহ কারে ;
মিলে প্রাণে প্রাণে, অনন্ত মিলনে,
ভাসে প্রেম পারাবারে।
হরিপ্রিয় জনে, তুষিব কেমনে,
এই ভাবে অনুদিন ;
হরিপ্রিয় কাজে, মানব সমাজে,
একেবারে হয় লীন।"

বালকগণ উপস্থিত হইয়াই প্রবোধচন্দ্রকে নমস্কার পূর্ব্বক কহিল, "দাদা প্রবোধচন্দ্র! ভাল আছ ত?" প্রবোধচন্দ্র

তাহাদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তোমাদের দাদা হইয়াও কি আর আমার কোন বিপদ থাকিবে?" সত্যসখা কহিল, "দাদা! আজ তোমাকে দেখিয়া আমাদের বড়ই আনন্দ হইতেছে।" প্রবোধচন্দ্র বলিলেন, "সে আমার কোন গুণে নয়, কিন্তু তোমরা আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাস বলিয়া।" এমন সময়ে সত্যানন্দ গান গাহিতে গাহিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবামাত্রই প্রবোধচন্দ্র উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! এই দেখ, তোমাদের সঙ্গগুণে আমার মত মহাপাতকীও তরিয়া গেল। ভাই! একবার প্রাণ ভরিয়া 'হরিবোল' বল। ভক্তদল আনন্দে বারম্বার হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বৃদ্ধ মহর্ষি যোগানন্দ সেই স্থানে সমাগত হইলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা পুরঃসর চরণে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া উপবিষ্ট হইলে, মহর্ষি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,"দেবতা তোমাদিগের মঙ্গল করুন।" প্রবোধচন্দ্র কহিলেন, "গুরুদেব! আপনার চরণকৃপায় আমি বহু দেশ, পর্ব্বত, কানন প্রভৃতি সন্দর্শন, নানাবিধ সাধু, শাস্ত ও ভগবদ্ভক্তজনের সঙ্গলাভ এবং নানা প্রকার প্রলোভন ও পরীক্ষায় শ্রীহরির কৃপায় জয়লাভ করিয়া অদ্য ভবদীয় সকাশে উপস্থিত হইয়াছি। আমার বাল্যকালের বন্ধু রামদাস ও শ্যামদাসও নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে পড়িয়া শেষে হরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন। পথিমধ্যে ইহারা আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন।"

ঐই বলিয়া প্রবোধ রামদাস ও শ্যামদাসের আমূল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে মহর্ষির গোচর করিলেন। অম্বিকাকালনা-নিবাসী সেই গৃহস্থটীরও পরিচয় প্রদান করিলেন। শেষে কমলিনীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "মহর্ষে! আমার জননীর সকল সংবাদই আপনি অবগত আছেন। ইহাঁকে যে এরূপে সন্ন্যাসিনী বেশে দর্শন করিব, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পতিতপাবনের করুণায় আজ অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। পিতৃদেবের মৃত্যুতে আমার মঙ্গলই হইয়াছে। এক্ষণে আমরা সকলেই এখানে উপস্থিত আছি, এই সময়ে আপনি আমাদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।" যোগানন্দ আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"নদীর তীরে পথের ধারে যেমন অসংখ্য বালুকাকণা চিক্ চিক্ করে দেখিতে পাও, তেমনই ঐ উপরের আকাশে বালুকাকণার মত অনন্ত নক্ষত্র চিক্ চিক্ করিতেছে। উহারা সকলেই পৃথিবীর মত এক একটা লোক। উহাদিগের কোনটার কিরণ পৃথিবীতে আসিতে সাত মিনিট লাগে, কোনটার সাত ঘণ্টা, কোনটার সাত দিন, কোনটার সাত মাস, কোনটার সাত বৎসর, এবং কোনটার কিরণ অদ্যাপিও পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছে নাই। এই সম্প্রদায় লোকের উপরে ব্রহ্মলোক অবস্থিত। আমাদিগের লক্ষ্য ঐ ব্রহ্মলোক। এই পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া উন্নতির পর উন্নতির ভিতর দিয়া আমাদিগকে ঐ ব্রহ্মলোকে যাইতে হইবে। এখানে আমরা ধনমান প্রভৃতি উপার্জ্জনের জন্য কতই পরিশ্রম করি, কিন্তু,

আমাদিগের মৃত্যুকালে সে সব এখানেই পড়িয়া রহিবে; কিছুই সঙ্গে যাইবে না। কেবল এই জগৎ-কৌশল দেখিয়া আমরা যে ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিব, তাহাই আমাদিগের সঙ্গে যাইবে। এখানে আমরা যেমন সাধনভজন করিব, তাহারই তারতম্যানুসারে আমরা উন্নত হইতে উন্নততর লোকে স্থান পাইব। বিদ্যালয়ের শিক্ষক যেমন উপযুক্ততানুসারে ছাত্রদিগকে এক শ্রেণী হইতে অন্য উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নমিত করেন, পরম পিতাও তেমনই আমাদিগের সাধনের উপযুক্ততানুসারে আমাদিগকে উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে লইয়া যাইবেন। সাধন আর কিছুই নহে; কেবল এই জগৎ-কৌশল দেখিয়া তাঁহার বিষয়ে জ্ঞান উপার্জ্জন করাই সাধন। এই জগৎ কৌশলের মধ্যেই তিনি সমুদায় রাখিয়াছেন। তাঁহার সত্য, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার মঙ্গলভাব, সমুদায়ই এই জগতে প্রকাশিত। তিনি পশুদিগের চক্ষু নীচের দিকে দিয়াছেন, যেহেতু, তাহারা মাথা নীচু করিয়া তৃণাদি দর্শন ও ভক্ষণ করিবে; এবং আমাদিগের চক্ষু উপরের দিকে দিয়াছেন, কেন না, আমরা উপরের দিকে চাহিয়া তাঁহারই অনন্ত কৌশল দর্শন করিয়া তাঁহাকেই উপলব্ধি করিব। চক্ষু পাইয়া যদি তাঁহাকেই না দেখিলাম, তবে চক্ষের সার্থকতা আর কোথায় হইবে? এখানে আমাদের এক দেশের পর আর এক দেশ দেখিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু, চিরজীবন দর্শন করিলেও এই পৃথিবীর সমুদায় রচনা দেখা যায় না। কিন্তু, এ সমুদায়ই তাঁহারই রাজ্যের এক পৃষ্ঠা

মাত্র।, আকাশের অনন্ত নক্ষত্র-অক্ষরে তাঁহার মহিমা-পুস্তকের এক পৃষ্ঠামাত্র আমরা দেখিতে পাই। না জানি, ইহার অন্য পৃষ্ঠায় ইহা অপেক্ষাও কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ আছে! এখানে এখানকার মহিমা দেখিবার উপ-যুক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় পাইয়াছি; যখন এখান হইতে অন্য উচ্চতর লোকে যাইব, তখন সেখানকার মহিমাদর্শনের উপযুক্ত কতই উচ্চতর ইন্দ্রিয় পাইব! এখানে হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থপরতা প্রভৃতির জন্য একজনকে ভালবাসা দিয়া তদ্বিনিময়ে ভালবাসা নাও পাইতে পারি, কিন্তু, যখন দেব-লোকে দেবতাদের সঙ্গে প্রণয় সংস্থাপন হইবে, না জানি তখন কতই আনন্দ হইবে! এক্ষণে তাঁহাকে বিদ্যুতের মত চঞ্চলভাবে দেখিতে পাই, কিন্তু, যখন উচ্চ হইতে উচ্চ-তর লোকে যাইব, তখন সেখানে তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা আরও কত উজ্জ্বলতর ও স্থিরতর ভাবে সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব!] অতএব এখানকার, এই মর্ত্যভূমের, এই অসার সংসারের সমুদায় মায়ামমতা পরিহার পূর্ব্বক ঐ উচ্চতম ব্রহ্মলোকে, ঐ চিরানন্দপরিপূর্ণ শাশ্বত বৈকুণ্ঠক্ষেত্রে, ঐ অমরদলনিষেবিত অমরপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। এখানে তোমাদের প্রাণের পিপাসা কিছুতেই মিটিবে না, এখানে শতসহস্র আনন্দের মধ্যেও রোগশোকযন্ত্রণায় সর্ব্বদাই পরিক্লিষ্ট হইবে। অতএব সর্ব্বদাই সংযত চিত্তে সাধনায় প্রবৃত্ত হও, বিপদেসম্পদে, রোগেশোকে, সর্ব্বদাই হরিপদপঙ্কজক্ষরিত অমৃতধারা পান কর। হিংসায় প্রতিহিংসা করিও না, ক্রোধের প্রতিশোধ

লইও না; বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বদাই পরহিতব্রতে প্রবৃত্ত থাক। এ দেহ অবসানে ভাগবতীতনু ধারণ করিয়া ঐ দেববাঞ্ছিত দেবলোকে গিয়া চরিতার্থ হইবে।”

মহর্ষির উপদেশবাক্য সমাপ্ত হইলে সত্যানন্দ হিতন্ত্রী বীণাসংযোগে গাহিলেন—

“চলেছে তরণী, প্রসাদ পবনে,
কে যাবে এস হে, শান্তিভবনে।
এ ভব সংসারে, ঘিরেছে আঁধারে,
কেন রে হেথা বসে ম্লানমুখ!
প্রাণের বাসনা, হেথায় পূরে না,
হেথা কোথা প্রেম, কোথা সুখ।
এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল
এ দুখ শোকানল দূরে যা’ক,
সম্মুখে চাহিয়ে, পুলকে গাহিয়ে,
চলরে শুনি চলি তাঁর ডাক;
বিষয় ভাবনা, লইয়ে যাব না,
তুচ্ছ সুখ দুঃখ পড়ে থাক।”

সঙ্গীতান্তে সকলে নিমীলিত নয়নে ধ্যানমগ্ন হইলেন। তপোবনভূমি নীরব হইল। বৃক্ষগণও যেন ঋষিমণ্ডলীর সহিত পরম পুরুষের ধ্যান করিতে লাগিল। পক্ষীকুল যেন যোগানন্দে উন্মত্ত হইয়াই শাখায় শাখায় নাচিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ব্রহ্মচরণে নমস্কার করিয়া সকলে শঙ্খধ্বনির সহিত সমস্বরে বলিলেন—

“শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।”

প্রথমখণ্ড হরিলীলা সম্বন্ধে অভিমত

It is a theological work, based upon simple and admitted truths, and is written with great care and reflection. The author endeavours to show that implicit confidence in God ensures happiness in mind and soul, and that salvation can be attained thereby. The picture which he has drawn is of a young man following the path of vice, and at last, tired of evil pleasures, turned to the righteous path by association with *Sadhus* or sages. It is a book full of instructions, and may be read advantageously by every one interested in religion.

The Indian Daily News, January 16, 1890.

This is a small *brochure*, containing good religious instructions. It is well written, and deserves encouragement.

The Indian Mirror, February 27, 1890.

The religious tale, which this *brochure* embodies, is drawn on the lines of the well-known *Nava Brindaban* Drama, though the scope of it is not so wide or varied. It is written from the New Dispensation point of view, but great ingenuity has been displayed by the writer in rendering it acceptable to the followers of orthodox Hindus. We trust, the other instalments, which the writer promises to bring out, will be as entertaining as the one under notice.

The Indian Mirror, June 25, 1890.

এই পুস্তক পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করা যায়। হরিলীলা হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

* * * *

ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই মাঘ ১৮১১ শক।

এই পুস্তকখানিতে আন্তরিক অনুতাপ ও সাধন প্রভাবে কি রূপে পাপীর "সাংসারিক জীবন বিনষ্ট হইয়া স্বর্গীয় জীবন আরম্ভ হয়," "হরিনামের বলে জীব ইচ্ছামাত্রেই স্বর্গে যাইতে পারে," "পরম মাতা বিশ্বজননী সন্তান বৎ-

নই 'ম্যা' বলিয়া ডাকে তখনই উত্তর দেন" ইত্যাদি ভক্তিতত্ত্বের সার কথাগুলি লইয়া গ্রন্থকার একটী সুচারু উপন্যাস রচনা করিয়া তাহা সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। "হরিধন চিরকাল স্পর্শমণি হইয়া অনন্ত শান্তিসুখে জীবকে কৃতার্থ করে। রাজার সিংহাসন টলিয়া যাইবে, ধনীর ধন নিঃশেষিত হইবে, কিন্তু হরিভক্তি রূপ ধন অটল অব্যয় হইয়া অনন্তকাল সঞ্চিত থাকিবে" ইত্যাদি মধুর অধ্যাত্ম উপদেশ গ্রন্থখানি মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। ইহা পাঠ করিলে ভক্তিরসের তরঙ্গ চিত্তে প্রবাহিত হয়, হরিনামে রুচি হয়, চিত্ত সাংসারিক আকর্ষণ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া ক্ষণকালের জন্যও পরমার্থরসপানে উন্মুখ হয়। গ্রন্থকার কহেন ভগবান ভক্তকে বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন ও ইহা প্রাচীন ভক্ত জীবনের উল্লেখ করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮১১ শক।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে পতিতপাবন হরি, পাপী তাপী দুঃখীকে উদ্ধার করিবার জন্য পাপীর হৃদয়ে যে লীলা বিহার করিতেছেন, তাহাই "হরিলীলা।" এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিলে বাস্তবিক তাপিত প্রাণ শীতল হয়; হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। পাপে তাপে তাপিত হইয়া যাঁহারা শান্তি-বারির অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছেন, তাঁহারা "হরিলীলা" পাঠ করিলে উপকার পাইবেন।

সুলভ সমাচার ও কুশদহ, ২৩শে চৈত্র, ১২৯৬।

"হরিলীলা" ১ম খণ্ড পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রবোধের দেবদূতের সহিত কথোপকথন, পরীক্ষা ও আধ্যাত্মিক ভাব বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ২য় ও ৩য় খণ্ড ক্রমশঃ প্রকাশ হইবেক শুনিয়া তৎপ্রাপ্ত্যাশায় সন্তুষ্ট রহিলাম।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,
দার্জিলিং।